আমাদের শরৎচন্দ্র

রবিদাস সাহারায়

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
১৯৬০

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯
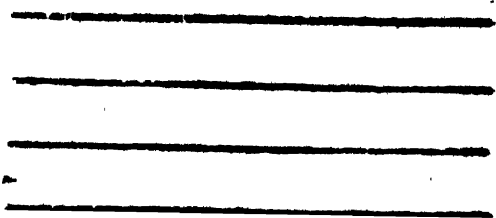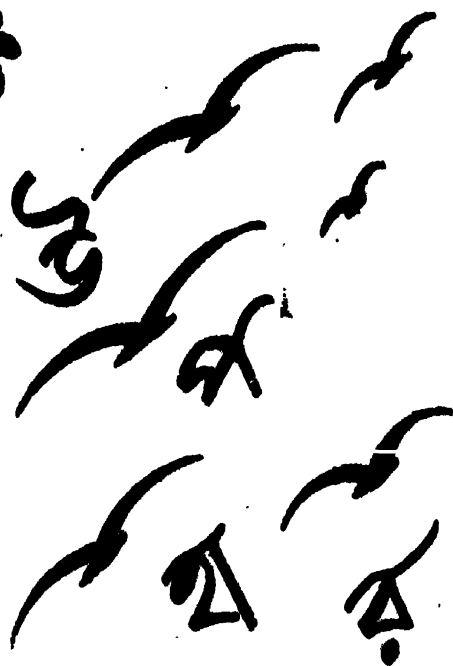
আমাদের শরৎচন্দ্র

আমাদের শরৎচন্দ্র

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবন একটি বিরাট উপন্যাস। এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যিকের জীবনেই দেখা যায়। শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন—"আমার যা-কিছু বলবার তার সবই আছে আমার বইয়ে। এত বেশী আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না। আমার বই থেকে যদি কেউ আমার জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না পারে, সে আমার জীবনের কথা লিখতে পারবে না।"

রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

আমরাও অবাক্ হয়ে ভাবি শরৎচন্দ্র কি গভীর দরদ দিয়ে কেমন আশ্চর্য কৌশলে আমাদের সমাজ চিত্রের ছবি এঁকেছেন এমন মানুষ আমাদের দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে আমাদের গৌরব, আমাদের বহু পুণ্যার্জনের ফল। তাঁকে ছাড়া আমরা বুঝতেই পারতাম না, আমরা কি পেয়েছি আর কি হারিয়েছি। এই মরমী কথাশিল্পীর জন্ম-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে আমরা ধন্য।

রবিদাস সাহারায়

শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে কি ভাবে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করলেন, রবীন্দ্রনাথের এই লেখার ভিতর দিয়ে আশ্চর্যভাবে তা ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হলো। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তা'র পরীক্ষাও দিয়েছি। পাশ ক'রে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাই নি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হ'য়ে আজ পেন্‌শন্ ভোগ ক'রচেন।

এমন সময় বঙ্গদর্শন বা'হির হোলো। তা'তে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তখনকার মননশীল পাঠকেরা আশা করি তা'র মর্যাদা বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয় কিন্তু প্রভেদ এই যে তখনকার পাঠকেরা এখনকার মতো এত বেশি প্রশ্রয় পান নি। মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, ঐ একখানিই ছিল। কাজেই সাধারণ পাঠকের মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্দ অপরিমিত ছিল না। তাই পড়বার মনটা অতিমাত্র বিলাসী হ'য়ে যায়নি। সামনে পাত সাজিয়ে যা কিছু দেওয়া যেত তা'র কিছুই প্রায় ফেলা যেত না। পাঠকদের আপন ফরমালের জোর তখন ছিল না ব'ললেই হয়।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতা বশতই এটা বেশি বলা হলো। বঙ্গদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকেরা যে এত বেশি ভিড় ক'রে এল তা'র প্রধান কারণ, ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ঐ পত্রিকায়। এর পূর্বে বাঙ্গালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভাসুরের বৈঠক, ভাদ্র বৌ ঘোমটা টেনে তাকে দূরে বাঁচিয়ে চলত, তা'র জায়গা ছিল অন্দরমহলে। বাংলাদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসচে, ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি। বঙ্গদর্শনে সব প্রথম ঘেরাটোপটা তোলা হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক স্মার্ত পণ্ডিতরা সেই দুঃসাহসকে গঞ্জনা দিয়ে গুরুচণ্ডালী ব'লে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহাস্য মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল তাতে ধিক্কার যতই উঠুক এক মুহূর্তেই বাঙ্গালী পাঠকের মন ভুলেছিল। তা'র পর থেকে দরজা ফাঁক হয়েই চ'লেছে।

প্রবন্ধের কথা যাক্। বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজিতে যাকে বলে রোম্যান্স্। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূর দিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্য ছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তা'র রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তা'র সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপালকুণ্ডলায় সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙীন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তা'র রস আছে।

কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিস নয়। সৌন্দর্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জন করা চলে না, তবু ব'লতে হবে ঐ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো—নাও যদি থাকে তবে বস্তু পদার্থটার অভাবে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা দেখতে মানায় কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায়নি—তাদের সাজ সজ্জা আছে কিন্তু পরিচয় পত্র নেই। তা'রা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা তা'রা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তা'রা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতিরা যা খুশি তাই ক'রতে পারে কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চ'লতে হয় যে পাঠকদের মনোরঞ্জনে ত্রুটি না ঘটে।

আরব্য উপন্যাসও কাহিনী, কিন্তু সে হোলো বিশুদ্ধ কাহিনী। সম্ভবপরতার জবাবদিহি তা'র একেবারেই নেই। জাদুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট ক'রেই ব'লছে, এ আমার অসম্ভবের ইন্দ্রজাল, সত্য মিথ্যা, যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের খুশি করব—যেখানে সবই ঘটতে পারে সেখানে এমন কিছু ঘটায়, যাতে তোমরা শাহারজাদীকে বলবে, থেমো না, রাত্রির পর রাত্রি যাবে কেটে।

কিন্তু যে সব কাহিনীর কথা পূর্বে ব'লেছি সেগুলি দো-আঁসলা, তা'রা খুশি ক'রতে চায়, সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস ক'রতে পারছে

মন যে-নির্ভর পায় তা'র একটি গভীর আরাম আছে। কিন্তু যে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী নয়, কাহিনী প্রায়, তাদের মধ্যে মনটা ডুব জলে সন্তরণ করে, তলায় কোথাও মাটি আছে কি নেই সে কথাটা স্পষ্ট হয় না, ধ'রে নিই যে মাটি আছে বৈ কি।

বিষবৃক্ষ কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল—ক্লাসিক্যাল অস্পষ্টতা বা রোম্যানটিক অস্পষ্টতা, অর্থাৎ ধ্রুপদী দূরত্ব বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুত কাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না কম দেখি। ঐ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক ব'লে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ চশমা পরে' জগৎটা যখন স্পষ্টতর হোলো তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয়বসন্তেও একদিন বাঙ্গালী পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তা'র পরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান। কিন্তু তখনো ঠিক চশমাটি সে পায়নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা জানত না যে সে পায় নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, সে যেন আরো স্পষ্ট।

তার পরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্ম নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরব গর্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যে রসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হ'য়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুটকি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তা'হলে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ঐ জিনিসটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চলতি সেন্টিমেণ্ট ত সাহিত্যের পক্ষে কচুরিপানার মতোই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়।

আধুনিক য়ুরোপে এই দশা ঘটেচে,—সেখানে আর্থিক সমস্যা, স্ত্রীপুরুষের সমস্যা, বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব সমস্যায় সমাজে একটা বিপর্যয়কাণ্ড চলচে। লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকার প্রবেশ

ঠেকিয়ে রাখা দায়, নভেলগুলি, গল্পের মসলামাথানো প্রবন্ধ হয়ে উঠল। এতে ক'রে সাহিত্যে যে স্তূপাকার আবর্জনা জমে উঠেচে সেটা আজকের পাঠকদের উপলব্ধিতে পৌঁচচ্চে না, কেননা আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন ষোল আনা ভর্তি হয়ে রয়েচে। আরেক যুগে এই সব আবর্জনা বিদায় করবার জন্যে গাড়ীতে যমের বাহন মহিষ অনেকগুলি জুৎতে হবে।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টিষ্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হ'চ্চে দেখানো, বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা। রসের জগৎকে স্পষ্ট ক'রে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন ক'রে তোলা।

সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলেরই সামগ্রী। বিষবৃক্ষ প'ড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিস। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়, ওটা ঘরের। বিশ্বের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।

বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলে অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্পসাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দা উঠল। সেদিন যেমন ভীড় ক'রে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্ত্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জাগিয়েচেন সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উৎঘাটিত ক'রেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চ'লচে। একদিন তা'রা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশাকরি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভুলে তবে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হ'য়ে গেল সেইটেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি পাওনা মাত্রই; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ অবশেষে যার পালা তিনি যদি খা দলিলগুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে।*

* প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও অনুমানুর 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আমাদের শরৎচন্দ্র—
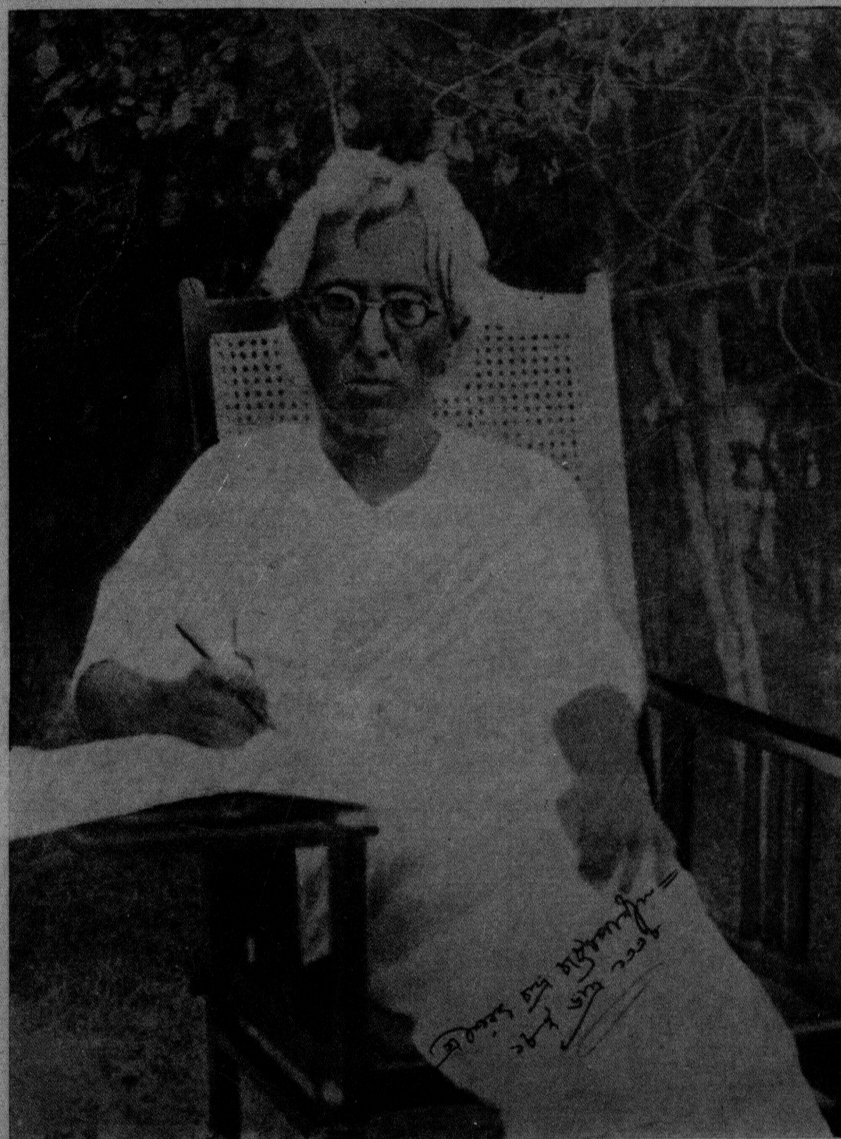
শরৎচন্দ্র

জন্ম—৩১শে ভাদ্র ১২৮৩ সাল

বাগানে অনেক ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। গাছের পাতায় পাতায় এখনো জল লেগে আছে। ফুটফুটে আলো ফুটেছে আকাশে।

ফড়িংগুলি একবার গাছের পাতায় এসে বসছে আবার উড়ে গিয়ে বসছে ফুলের ওপর। ওদের যেন আনন্দের শেষ নেই।

তেমনি আনন্দের শেষ নেই দুষ্টু ছেলেটিরও। দূর থেকে দেখে ছুটে এসেছে বাগানে। দুষ্টু ফড়িং-এর পেছনে সেও ছুটে বেড়াচ্ছে।

যেমনি ধরতে যায় অমনি ফড়িং ছুটে পালায়। এক গাছ থেকে গিয়ে বসে আর এক গাছে। সেখানে গিয়েই আবার ধরতে যায়। এবার ফড়িংটা গিয়ে বসে আরও উঁচুতে। কিছুতেই আর নাগাল পায় না ছেলেটি।

কি দুষ্টু ফড়িং রে বাবা!

দুষ্টুমিতে ন্যাড়াকেও হার মানায়!

ন্যাড়া এবার ছুটলো আর একটা ফড়িং-এর পেছনে। সেটাও উড়ে পালালো। এবার আর একটা। সেটাও পালালো। গিয়ে বসলো একটা ফুলের ওপর। অমনি ন্যাড়া খপ্ করে ধরে ফেললো।

এবার যাবি কোথায় দুষ্টু ফড়িং!

ন্যাড়া দুষ্টু ফড়িংটাকে ধরে ঘরে নিয়ে এলো। তারপর সুতো দিয়ে বাঁধলো তার পা।

এবার কি মজা! সুতো নিয়েই ফড়িংটা উড়তে লাগলো। সুতোর একটা দিক ধরা রইলো ন্যাড়ার হাতে। যেন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে সে। একটু দূরে উড়ে গেলেই আবার টেনে নিয়ে আসে কাছে। এমনি করে চলে মজার খেলা।

তারপর ফড়িংটাকে বেঁধে দেয় একটা গাছের ডালে। উড়ে যেতে চায়, পারে না।

হঠাৎ কি মনে হয় ন্যাড়ার। ফড়িংটাকে ধরে সে কত কষ্টই না দিচ্ছে। ওর হয়তো বাবা মা আছে, ভাই বোন আছে। ওদের কাছে যেতে পারছে না। ইস্, মনে কি দুঃখ ওর!

তখনই ধীরে ধীরে বাঁধন খুলে দেয় ফড়িংটার। মুক্তি পেয়ে আনন্দে সে আকাশে উড়ে যায়। ন্যাড়া অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে, ওরও ভারী আনন্দ হয়।

ন্যাড়া দুষ্টু, তাই বলে নিষ্ঠুর নয়। মনে ওর ভারী দয়া মায়া। নইলে বড় হয়ে এত সুন্দর গল্প লিখলো কেমন করে? এমন দরদ ভরা, মায়া মাখানো উপন্যাস ওর কলম দিয়ে কেমন করে বের হলো?

এই ন্যাড়াই তো শরৎচন্দ্র। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তখন আর বয়স কতো! ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্ম।

ডাক নাম ন্যাড়া।

মাত্র কিছুদিন আগে পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় সে ভরতি হয়েছে। নিজের গাঁয়ে দেবানন্দপুরেই এক ধারে মাঠের পাশে পাঠশালা। বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়।

হলে হবে কি! পড়াশোনার দিকে মোটে মন নেই। দুষ্টুমি আর খেলাধুলার দিকেই ঝোঁক।

সঙ্গীও জুটেছে ভালো। পিয়ারী পণ্ডিতেরই ছেলে কাশীনাথ। কাশীনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব ভাব। যত আড়ি ট্যাপার সঙ্গে।

সর্দার পড়ুয়া ট্যাপা। একটু ফাঁকি দেবার উপায় নেই ওর জন্য।

একদিন কাঠফাটা দুপুরে পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন

পিয়ারী পণ্ডিত। চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়বার আগে সবাইকে অঙ্ক কষতে দিয়েছেন। ভারী কঠিন অঙ্ক।

কিন্তু এই সময়ে অঙ্ক কষতে কি আর ভাল লাগে? তাও যদি সহজ অঙ্ক হতো।

ন্যাড়া সেলেটে লিখছে আর মুছছে। কাশীনাথেরও সেই অবস্থা। ভাবছে একটা ছুতো পেলেই উঠে যাবে।

এমন সময় ওপাশ থেকে একটি ফুটফুটে মেয়ে ডাকলো—ন্যাড়া!

ন্যাড়া মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো—পারু। এই পাঠশালাতেই পড়ে। ওদের পাড়ারই মেয়ে।

পারু বললো—জল খেতে যাবি না?

ন্যাড়া বললো—হ্যাঁ, যাবো। কাশী, তুই যাবি না? চল্ জল খেয়ে আসি।

এই তো সুযোগ। বেরিয়ে গেল ন্যাড়া, কাশীনাথ আর পারু। যখন তারা ফিরলো তখন পিয়ারী পণ্ডিতের দিবানিদ্রা সাঙ্গ হয়েছে। সর্দার পড়ুয়া ট্যাপা এতক্ষণ হিংসায় জ্বলছিল। এবার নালিশ করলো—ন্যাড়া অঙ্ক করে নি স্যার। ওরা বাইরে ঘুরতে গিয়েছিল। অনুমতি নিয়ে যায় নি।

পিয়ারী পণ্ডিত গর্জে উঠলেন—কি, অনুমতি নিয়ে যাস্ নি! অঙ্ক করেছিস? দেখি সেলেট—

স্লেটে অঙ্ক নেই। শুধু কি হিজিবিজি আঁকা।

পিয়ারী পণ্ডিতের লিকলিকে বেত লকলক করে উঠলো।

—কাশীনাথও করে নি স্যার। সর্দার পড়ুয়ার অভিযোগ।

—তুইও করিস নি?

কাশীনাথের অবস্থাও ন্যাড়ার মতই। কাজেই শাস্তি জুটলো ন্যাড়া আর কাশীনাথের ভাগ্যে। পাঁচ ঘা করে বেত।

দাঁত বের করে হাসতে লাগলো ট্যাপা। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে ন্যাড়া মনে মনে বললো—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাবো মজা।

পিয়ারী পণ্ডিত নালিশ করলেন ন্যাড়ার বাবা মতিলালের কাছে : আপনার ছেলে ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছে। লেখাপড়ায় মন নেই। মাঝে মাঝেই ইস্কুল পালিয়ে বেড়ায়।

তাই নাকি ? পেটে পেটে এত দুষ্টুবুদ্ধি!

মতিলাল সেদিন বাড়ি ফিরেই ছেলেকে ভয়ানক বকুনি দিলেন। বকুনি খেয়ে ন্যাড়া ঠাকুরমার আঁচলের আড়ালে গিয়ে লুকোলো।

গাঁয়ের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ চলে গেছে সরস্বতী নদীর দিকে। দু'পাশে আমবাগান, জাম, বাতাবি ও কাঁঠালের গাছ। বনধুর ও বেতসের ঝোপঝাড়ও আছে। মাঝে মাঝে ডোবা পুকুর আর মাঠ।

এই তাঁর সোনার গ্রাম দেবানন্দপুর।

দল গড়েছে ন্যাড়া। কাশীনাথ তো আছেই, আরও কয়েকটি গাঁয়ের ছেলে জুটলো তার দলে। পারু মেয়েটিও তাদের সঙ্গী। কোন্ বাগানের ফল পেকেছে, কোথায় কি পাওয়া যায় তার খবর সবার চেয়ে সে ভালো জানতে পারে।

এবার দুরন্তপনা শুধু পাঠশালাতেই নয়, বাগানে ও মাঠে তা ছড়িয়ে পড়লো।

কবে নষ্টচন্দ্র—পাঁজির খবর তাদের সবার আগে জানা। সেদিন কত গাছের বাতাবি আর কত ঝোপের আখ যে লোপাট হলো—তার হিসাব নেই। পরদিন তার খবর পাওয়া গেল। মালিকদের বুঝতে বাকী রইলো না, এসব ন্যাড়ার দলের কাণ্ড।

আম কাঁঠালের মরশুমে, লেবুর দিনে গৃহস্থের চোখে ন্যাড়ার দল যেন মূর্তিমান বিভীষিকা।

নালিশ আসে দুষ্টু ছেলেদের নামে। কিন্তু ন্যাড়ার নামেই বেশী অভিযোগ। কারণ সে দলের পাণ্ডা।

মতিলাল কোন কোন দিন ভয়ানক রেগে গিয়ে মারতে যান শরৎচন্দ্রকে। কিন্তু সে তখন কোথায় ? সে হয়তো ঠাকুরমার কাছে লক্ষ্মী ছেলেটির মত বসে মহাভারত শুনছে।

বংশের প্রথম ছেলে শরৎচন্দ্র। তাই জন্মের পর থেকে মা ও ঠাকুরমার স্নেহ-আদর তার ওপর খুব বেশী।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও ভুবনমোহিনী দেবীর প্রথম সন্তান কন্যা অনিলা, দ্বিতীয় সন্তান শরৎচন্দ্র। বাবা শাসন করলেও ছেলেকে ভালবাসতেন খুব। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যত আবদার তার মা ও ঠাকুরমার কাছে। সেজন্যই সে হয়ে উঠেছিল খুব আদুরে আর অভিমানী।

দুরন্ত হলেও শরৎচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই ভয়ানক সাহসী। কোন্ আমবাগানে দুপুরবেলা ভূতেরা জটলা করে, কোন্ চালতাগাছের নীচে শাঁকচুন্নীর কান্না শোনা যায়—ভয়ে কেউ সহজে এগোয় না সেদিকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভয় নেই একটুও।

দলের ছেলেদের সে বলে—চল্ না যাই ওখানে।

—ও বাব্বাঃ, মরতে যাবো! ভয়ে কেউ এগোয় না।

শরৎচন্দ্র একাই এগিয়ে যায়। ঘুরে আসে আমবাগান আর চালতাতলা। সবাই অবাক্ হয়ে যায়। কি সাহস ছোঁড়ার!

একদিন শরৎচন্দ্র বায়না ধরে বসলো—ছিপ কিনবে।

মাছ ধরার তার খুব শখ। কিন্তু ভাল ছিপ নেই। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছিপ তৈরি করে মাছ ধরে মাঝে মাঝে পুকুরে ও ডোবায়।

যত বায়না ঠাকুরমার কাছে। বসন্তপুর হাটে ছিপ কিনতে যাবে। সেখানে ভাল ছিপ পাওয়া যায়।

ঠাকুরমা আদুরে নাতিকে চুপি চুপি পয়সা দিলেন।

পয়সা তো হলো। এখন যাবে কার সঙ্গে?

খুঁজে খুঁজে ঠিক সঙ্গী বের করলো শরৎচন্দ্র। নয়নচাঁদ যাবে বসন্তপুর হাটে গরু কিনতে। গাঁয়ের দুর্দান্ত লাঠিয়াল নয়নচাঁদ। সবাই তাকে চেনে, ভয়ও করে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার খুব ভাব। নয়নচাঁদ তাকে খুব ভালও বাসে।

নয়নচাঁদের সঙ্গে যাবে কাজেই ভয় কি! কারুর আপত্তি রইলো

না। বেশ খুশী মনে শরৎচন্দ্র বসন্তপুর হাটে চললো ছিপ কিনতে। বেলা করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, কাজেই ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ন্যাড়ার হাতে ছিপ আর নয়নচাঁদের হাতে দড়িতে বাঁধা গরু।

এ পথে চোর ডাকাত ঠ্যাঙাড়েদের বড় উপদ্রব। সন্ধ্যা হলে পারতপক্ষে লোক চলাচল করে না। ঝোপে ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে ঐ সব দুষ্কৃতকারীর দল। ঠ্যাঙাড়েরাই বড় সাংঘাতিক। পথে যাকে তাকে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়, খুন করে। যা পায় সব লুটে নেয়।

লাঠিয়াল নয়নচাঁদ তা জানে। কাজেই তার বাঁশের পাকা লাঠিটা হাতে নিয়েই সে বেরিয়েছে।

সেই নির্জন পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়ালো। ঝোপের ভিতর থেকে কিসের যেন আর্তনাদ ভেসে আসছে।

শরৎচন্দ্র বললো—নয়নদা, ঐ শোন কে যেন কাঁদছে।

নয়নচাঁদ বললো—নিশ্চয়ই ঠ্যাঙাড়েরা কাউকে ধরেছে।

—আহা বেচারী! শরৎচন্দ্রের বুক ভেঙে বেরিয়ে এলো একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস।

নয়নচাঁদ বললো—গরুটাকে একটু ধর্ তো ন্যাড়া। দেখি লোকটাকে বাঁচাতে পারি কিনা।

গরুটা শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়ে নয়নচাঁদ পাকা লাঠিটা বাগিয়ে চললো ঝোপের ভেতর সেই শব্দ লক্ষ্য করে। কিন্তু বেশী দূর আর যেতে হলো না। দু'জন ঠ্যাঙাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। ওদিকে ঝোপের ভেতর লোকটাকে হয়তো শেষ করে ফেলেছে।

এক শিকার শেষ করতে না করতেই আর এক শিকার! আজ বরাত খুব ভালো। খুশীমনেই এগিয়ে এলো ঠ্যাঙাড়েরা। কিন্তু তারা কি আর জানে যে নয়নচাঁদ পাকা লাঠিয়াল! তারা ঘা দেবার আগেই নয়নচাঁদ এমনভাবে তাদের ঘায়েল করলো যে দু'জনেরই হাতের লাঠি গেল উড়ে। তারপর দমাদম পিটুনি।

ঠ্যাঙাড়ে দু'জন প্রাণভয়ে পালাতে আর পথ পায় না। ঝোপের

ভেতর ঢুকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নয়নচাঁদ বললো– চল্ ন্যাড়া, সেই হতভাগ্য লোকটাকে দেখে আসি।

ন্যাড়া আগেই গরুটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল। নইলে এমন হুইচই-এর মধ্যে গরুটাকে সামলে রাখা দায় হতো।

ঝোপের ভিতর ঢুকে তারা দেখতে পেল একটা লোক মরে পড়ে আছে। লোকটার পরনে গেরুয়া কাপড়। আহা বেচারী! নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণব বাউল এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়ে এমন ভাল মানুষেরও এই দশা হলো।

নয়নচাঁদ নেড়ে চেড়ে দেখলো, মরে গেছে লোকটা। মাথায় ও মুখে রক্ত—পরনের কাপড় রক্তমাখা।

মনে দুঃখ হলো নয়নচাঁদের। কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছলে হয়তো লোকটাকে বাঁচাতে পারতো। শরৎচন্দ্রের মনেও দুঃখের অন্ত ছিল না। সারাটা পথ ঐ হতভাগ্য লোকটার কথা ভাবতে ভাবতে চললো।

নতুন ছিপ এনেছে ন্যাড়া, এখন কি আর বসে থাকতে পারে! শুরু হলো পুকুরে ও নদীতে মাছ ধরা। ফুল চুরি, ফুলের বাগান তছনছ করা—এসব উৎপাত তো লেগেই রইলো।

টঁ্যাপার ওপর আক্রোশ কিন্তু কমে নি। একদিন টঁ্যাপা ঝিমুচ্ছিল, পাশেই ছিল চুনের গাদা, ন্যাড়া ও কাশীনাথ ধাক্কা দিয়ে তাকে সেই গাদায় ফেলে দিল।

গায়ে মাথায় চুন মেখে টঁ্যাপা একেবারে ভূত!

ন্যাড়া দুষ্টুমি করে, পাঠশালা পালিয়ে বেড়ায় তবু পরীক্ষায় বেশী নম্বর পায়। তাই টঁ্যাপার হিংসা হয়, বানিয়ে বানিয়ে পিয়ারী পণ্ডিতের কাছে নালিশ করে।

ন্যাড়ার ভাগ্যে জোটে বকুনি আর প্রহার।

ওদিকে গাঁয়ের লোকেরও নালিশের বিরাম নেই। মতিলাল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নাঃ ওকে নিয়ে আর গাঁয়ে বাস করা যাবে না দেখছি।

দুই

দেবানন্দপুরে মতিলালের দিন আর কাটে না।

অতি কষ্টের সংসার। তার ওপর নানা ঝামেলা।

মতিলাল নিজে লেখাপড়া শিখেছেন। তখনকার দিনে এণ্ট্রান্স পাস। তা ছাড়াও পড়াশোনা করেছেন বিস্তর। ছবি আঁকতে পারতেন ভালো। সাহিত্যেও ছিল তাঁর উৎসাহ। ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক—সব কিছুতেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যই ছিল তাঁর জীবনে বিরাট প্রতিবন্ধক। কোন কিছুই ভাল ভাবে চর্চা করতে পারেন নি।

নিজে এমন গুণগ্রাহী অথচ ছেলে মূর্খ হয়ে থাকবে এটা কি হতে পারে? কিন্তু তার উপায়ই বা কি?

মতিলালের স্ত্রী ভুবনমোহিনী ছিলেন হালিশহরের বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। কেদারবাবু থাকতেন ভাগলপুরে।

কেদারবাবু মেয়ের সংসারের অবস্থার কথা জানতেন। তাই ভুবনমোহিনীর কাছে পত্র লিখলেন সবাইকে নিয়ে ভাগলপুর চলে আসতে। মতিলাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে অবিলম্বেই রওনা হলেন ভাগলপুরে। মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন।

দেবানন্দপুর ছেড়ে চলে যেতে শরৎচন্দ্রের খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

এতদিনের চেনা পথ ঘাট, পুকুর নদী, বন জঙ্গল সব কিছুর মধ্যেই যেন কি এক মায়া জড়ানো। যে পাঠশালায় যেতে মন চাইতো না, সেই পাঠশালার জন্যও মন কেমন করতে লাগলো।

সবচেয়ে মন বেশী খারাপ লাগতে লাগলো কাশীনাথ আর পারুর জন্য। ট্যাপা ওর দু'চোখের বিষ হলেও হঠাৎ কেন যেন ওর ওপর একটা মায়া পড়ে গেল।

ওদের চলে যাবার কথা শুনেই পারু আর কাশীনাথ ছলছল চোখে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো· তুই চলে যাবি ন্যাড়া ?

ন্যাড়ার মুখ দিয়ে কথা বের হলো না। শুধু মাথা নেড়ে নীরবে জানালো—হ্যাঁ।

বাবা মার সঙ্গে ভাগলপুর মামা বাড়িতে চলে এলো শরৎচন্দ্র।

দাদু আর মামাদের আদর পেয়ে বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ সে ভুলে গেল। নতুন জায়গায় মন বসে গেল তার। বিরাট বাড়ি। লোকজন চাকরবাকর দরোয়ান ও বরকন্দাজে বাড়ি সবসময়ে গমগম করছে। বাড়ির সবাই প্রতিষ্ঠাবান। কেউ উকিল কেউ বা বড় চাকুরে। কোন দুঃখ বা অভাবের কোন চিহ্ন এখানে নেই।

ভাগলপুরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁধানো ঘাট। ঝোপ জঙ্গল, মাঝে মাঝে পুরনো আমলের বাড়ি ও বাগানবাড়ি। শরৎচন্দ্রের কিন্তু বেশ লাগে।

সবচেয়ে ভালো লাগে মানিক সরকারের ঘাটের পাশে অসংখ্য ঝুরি-নামা পুরনো বটগাছটা। মনে হয় যেন আদ্যিকালের জটিবুড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেও বন্ধুবান্ধব জুটতে দেরি হলো না। তাদের নিয়ে শুরু হলো ন্যাড়ার নূতনভাবে জীবনযাত্রা।

বুড়ো বটের ডালে উঠে দুরন্ত ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গায়। সাঁতার কেটে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে গিয়ে ওঠে।

মণি, সুরেন, দেবেন, গিরীন, উৎপল সবাইকে নিয়ে দল গড়েছে শরৎচন্দ্র। নির্ভীক চঞ্চল এই দলটির সে পাণ্ডা।

জঙ্গল তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ায়, মাছ ধরে, খেলা করে, ছুটোছুটি করে, কখনো বা গাছে চড়ে। হইহই করে কাটে তাদের দিন।

তাই বলে লেখাপড়ায় ফাঁকি দেবার উপায় নেই। গাঙ্গুলী বাড়িতে লেখাপড়ার দিকে সবার নজর।

ভাগলপুরে আসার পরেই শরৎচন্দ্রকে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। অক্ষয় পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে চলে এই স্কুল। বড় কড়া শিক্ষক এই অক্ষয় পণ্ডিত।

ছাত্ররা সবাই ভয় করে অক্ষয় পণ্ডিতকে। উঁচু লম্বা চেহারা, মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল, লম্বা দাড়ি। গলার কি জোর, ধমক খেলে পিলে চমকে যায়। ভাঁটার মত চোখের কটমট দৃষ্টি কারুর ওপর পড়লে তার বুক শুকিয়ে কাঠ।

এখন মানুষটিকে দেখলেই ভয় করে, তার ওপর কড়া হাতের চড় বা লম্বা বেতের দু'চার ঘা যে খেয়েছে সে ভুলতে পারবে না সহজে।

পণ্ডিতের ভয়েই ছাত্ররা পড়ে মন দিয়ে। কিন্তু 'সদ্ভাব সদ্‌গুরু' আর 'সরল ব্যাকরণ'টা এমন অসরল আর বিদঘুটে যে ভাল করে পড়লেও কোথাও না কোথাও আটকে যেতে হয়। তখন চড় বা বেতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

নাঃ, বড় অসহ্য ব্যাপার! এমন তুকতাক কি কিছু করা যায় না যাতে অক্ষয় পণ্ডিত নিজেই পড়া ভুলে যান বা তাঁর ডান হাতটা যায় অবশ হয়ে? দল বল নিয়ে পরামর্শ করে ন্যাড়া। ক্লাসের ছাত্ররা ন্যাড়াকেই ধরে বসে—তুই খুঁজে পেতে একটা কিছু বের কর।

হঠাৎ ন্যাড়ার মনে পড়ে যায়, কলকাতার বটতলার অনেক বইয়ে নানারকম হঠযোগ ও তন্ত্রমন্ত্র থাকে। সেই বই একটা যোগাড় হলে চেষ্টা করে হয়তো কিছু একটা করা যেত। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় সেই বই।

অনেক খুঁজে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া বই পাওয়া গেল—'সংসার

কোষ'। ব্যাস, তাতেই কাজ হলো। পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখা গেল, ওতে লেখা রয়েছে একটা আশ্চর্য মন্ত্র—'ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।'

এই মন্ত্র আওড়ালে নানারকম ভয়, কোপ ও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তখন সবার কি আনন্দ! এবার অক্ষয় পণ্ডিতকে কাবু করতে আর কষ্ট হবে না।

সবাই ভাল করে মন্ত্রটা শিখে নিল। অক্ষয় পণ্ডিত ক্লাসে এলেই মনে মনে আওড়াবে। তারপরই ফুরিয়ে যাবে পণ্ডিতের জারিজুরি।

কিন্তু কি মুশকিল! অক্ষয় পণ্ডিতের চেহারা দেখলে পড়া যেমন ভুলে যায় মন্ত্রটাও তেমনি যায় গোলমাল হয়ে। কোনদিন যদি বেত বা চড়ের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় তা হলে মনে মনে ভাবে হয়তো তা সম্ভব হয়েছে নেহাৎ কিছুটা সেই মন্ত্রের জোরেই।

এমনি করে কাটতে লাগলো দিনের পর দিন।

১৮৮৭ সাল।

শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করলো। এবার ভরতি হলো তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট ভাই অঘোরনাথ ছিলেন মালদহ চাঁচল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ মালদহেই থাকতো। ছুটির সময়ে তারা আসতো ভাগলপুরে, সেই সময়ে তারা হতো ন্যাড়ার সাগরেদ।

একা ন্যাড়া ভাগনে, আর মণি, সুরেন, গিরীন, দেবেন, উৎপল সবাই তার মামা। কাজেই তার মামা-বাহিনী ছিল বিরাট। তাদের দৌরাত্ম্যের কাহিনী কেদারনাথের কানে মাঝে মাঝে এসে পৌঁছতো। তিনি শাসন করবার জন্য সবাইকে ডাকাতেন।

এই কড়া লোকটির কাছে ঐ ডানপিটে বাহিনী ভয়ে জব্দ।

কেদারনাথ মাঝে মাঝে তাদের শাস্তির ভার দিতেন ন্যাড়ার বাবা মতিলালের ওপর। সেদিন কিন্তু সবার খুব মজা হতো। কারণ

তারা জানতো মতিলালের কাছে সাতখুন মাপ। তিনি দিনরাত বই পড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, আর সময় সময় কি সব লিখতেন। ঝামেলা মোটেই তিনি পছন্দ করতেন না। মৃদু ধমক বা উপদেশ দিয়েই ছেলেদের ছেড়ে দিতেন।

মতিলাল এখানে কোন কাজই করতেন না। বিরাট সংসার, প্রচুর রোজগার, তাই এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতো না। তবু স্ত্রী ভুবনমোহিনী সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতেন কখন কে এই নিয়ে খোঁটা দেয়। কিন্তু ছেলে এখানে পড়াশোনা করছে, মানুষ হচ্ছে সেজন্যই সব কিছু সহ্য করে থাকতেন।

ন্যাড়া মাঝে মাঝে রং তুলি নিয়ে কি সব আঁকতো। তা লক্ষ্য করে ভুবনমোহিনী চমকে উঠতেন। সর্বনাশ, ছেলে আবার বুঝি ওর বাবার স্বভাব পাচ্ছে! এই ছবি আঁকা আর বই পড়া নিয়ে থেকে থেকেই তো জীবনটা মতিলাল মাটি করে ফেললেন। তাঁর ছেলেও যদি এইভাবে চলে তবে সংসারের কি দশা হবে!

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ছেলের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, পড়াশোনা ছেড়ে ওসব কি করছিস?

শরৎচন্দ্র জবাব দিল—এসব তো স্কুলেরই কাজ মা। দ্যাখো না ম্যাপ আঁকছি। মাস্টার মশাই বলেন, আমার ম্যাপই নাকি সবার চাইতে সুন্দর হয়।

সেকথা শুনে ভুবনমোহিনীর মন থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঝা নেমে যায়। যাক্, তা হলে তাঁর ছেলে স্কুলের পড়াশোনা ঠিক মতই করছে।

মতিলালও মাঝে মাঝে ভুবনমোহিনীকে সান্ত্বনা দেন—দেখো তোমার ছেলে লেখাপড়ায় ভালো হবে। হাবা-গোবা ছেলে ও নয়, আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মতিলাল ও ভুবনমোহিনী কত আশা নিয়েই দিন কাটাতেন। এই ছেলেকে ঘিরে তাঁদের কত কিছু স্বপ্ন।

মামাবাহিনী ছাড়াও ন্যাড়ার দলে সমবয়সী অনেক ছেলে। সবারই সে দলপতি। একদিন সে এক শিকারীবাহিনী গঠন করলো। কিন্তু শিকার করতে হলে অন্ততঃ একটা বন্দুক চাই।

ন্যাড়া সকলকে অভয় দিয়ে বললো —কোন ভাবনা নেই, আমিই বন্দুক তৈরি করবো।

সবাই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো—বন্দুক তৈরি করবে তুমি! কি ভাবে?

ন্যাড়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বাঁশের বন্দুক তৈরি করবো।

একজন ঠাট্টা করে বললো—বাঁশের বন্দুক দিয়ে কি করবে! কাক মারবে নাকি?

ন্যাড়া ভুরু কুঁচকে বললো—তোদের কোন জ্ঞান নেই। জানিস, বাঁশের বন্দুক দিয়েও বাঘ, ভালুক, হাতি, বুনো শূয়োর সব কিছু শিকার করা যায়!

ছেলেরা সবাই অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো।

ন্যাড়া আদেশ দিল—পাকা বাঁশ ছাড়া ঐ বন্দুক হবে না। ভাল পাকা বাঁশ জোগাড় করতে হবে।

ছেলেরা মহা উৎসাহে খোঁজাখুঁজি করে পাকা বাঁশ জোগাড় করে নিয়ে এলো। ন্যাড়া তৈরি করে ফেললো এক অভিনব বন্দুক।

বন্দুক তো তৈরি হলো। কিন্তু তার পরীক্ষা তো করতে হবে। সেজন্য বের হতে হবে শিকারে।

কিন্তু বের হলেও এখন বাঘ, ভালুক, হাতি কোথায় পাওয়া যাবে? বুনো শূয়োর মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে এসে উৎপাত করে বটে, কিন্তু সে তো বর্ষাকালে। গঙ্গার জল বাড়লে ওপারের ক্ষেত সব ডুবে যায়, তখন আশ্রয়হীন বুনো শূয়োর সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে এপারে এসে ওঠে। সামনে লোক পেলেই তাকে আক্রমণ করে। বুনো শূয়োরের দেখা পেতে হলে সেই বর্ষাকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এখন কি করা যায়? শিকার না পাওয়া গেলে পরীক্ষা চলবে কেমন করে?

হঠাৎ একজন বলে উঠলো—কুকুর মারলে হয় না? একটা পাগলা কুকুর আছে, লোক দেখলেই সে কামড়াতে আসে। আমাকেও একদিন কামড়াতে এসেছিল।

সবাই বলে উঠলো—হ্যাঁ, কুকুর মেরেই পরীক্ষা হোক।

ন্যাড়া বললো—না, সাবধান!—কুকুর মারা হবে না। তোদের সবাইকে যদি কামড়ায় তবুও না।

তা হলে কি করা যায়? কে একজন বলে উঠলো—তবে বিড়াল মারা হোক।

কথাটা ন্যাড়ার খুব মনে ধরলো। সে লাফিয়ে উঠে বললো—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। বেড়ালই মারবো। ধরে আন্ একটা বেড়াল।

ন্যাড়ার একটা পোষা শালিক ছিল। সে আদর করে তার পায়ে বেঁধে দিয়েছিল একটা ঘুঙুর। সে উঠোনে নেচে নেচে বেড়াতো আর তার পায়ের ঘুঙুর বাজতো ঝুম ঝুম করে। একদিন এক হুলো বেড়াল তাকে খপ করে ধরে খেয়ে ফেলেছিল। সেই থেকে সমস্ত বেড়াল জাতটার ওপরেই তার আক্রোশ। কাজেই বেড়াল মারতে তার কোন আপত্তি নেই।

দলপতির নির্দেশে একটি বিড়ালকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে আনা হলো।

ন্যাড়া দেবেনকে বললো—দেবেন, তুই ওর গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে ধরে দাঁড়া, আমি বন্দুক ছুড়ি।

দেবেন বললো—ইস্, বন্দুকের গুলি যদি আমার গায়ে লাগে?

ন্যাড়া বললো—আমার 'এম্' অত খারাপ নয়। তোর গায়ে লাগবে না, ভয় নেই।

দেবেনের ভয় তবু কাটলো না। কিন্তু কি আর করবে, দলপতির হুকুম মানতেই হবে। কাজেই বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে সে

দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ঝুলন্ত বেড়ালটি হাত পা ছুড়ে ছটছট করতে লাগলো।

ছু' পক্ষই প্রস্তুত। এখন বন্দুক ছুড়লেই হয়।

সবাই মজা দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইলো।

ন্যাড়া বেড়াল লক্ষ্য করে ছুড়লো বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে বারুদের গন্ধে আর ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল।

ধোঁয়া কমলে দেখা গেল, একদিকে ন্যাড়া আর একদিকে দেবেন চিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। বিড়াল উধাও হয়ে গেছে কোথায়।

শিকার-পর্ব এখানেই শেষ।

তিন

কেবল লেখাপড়া শিখলেই হলো না। শরীর গঠনও করা চাই।

দলপতির মতোই ন্যাড়া দলের সকলকে নির্দেশ দেয়—নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

কিন্তু তার জন্য নির্জন জায়গা চাই।

একটু দূরে উত্তর দিকে গঙ্গার ধারেই একটা পড়ো বাড়ি আছে। সবাই ওটাকে বলে 'ভূতের বাড়ি'। ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিনের বেলাতেও অনেকে সাহস পায় না।

কিন্তু সেই বাড়িটাই ন্যাড়ার পছন্দ হলো। সেখানেই সে গড়ে তুললো ব্যায়ামের আখড়া। প্রথমে অনেকেই ওখানে যেতে রাজী হলো না। বললো—ব্যায়াম করতে এসে শেষে ভূতের পাল্লায় পড়বো না তো?

ন্যাড়া তাদের ঠাট্টা করে বললো—তোরাও যেমন। তোদের ব্যায়াম কুস্তি করা শরীর দেখলে ভূতেরা পালাবে না?

শেষে আস্তে আস্তে সকলের ভয় ভেঙে গেল। দল বেঁধে সবাই ব্যায়াম করতে লাগলো। এতই মেতে উঠলো সবাই, কখন যে ন্যাড়া সেখান থেকে চলে যেতো, কেউ লক্ষ্য করতো না। হঠাৎ খোঁজাখুঁজি পড়ে যেতো—কোথায় ন্যাড়া? ন্যাড়া কোথায়?

একদিন ব্যায়াম শুরু হয়ে গেছে, অথচ ন্যাড়ার দেখা নেই। কোথায় গেল ন্যাড়া? সে তো ব্যায়াম করতে এলো না।

সবার ব্যায়াম প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে পা ফেলে ন্যাড়া আসছে। সবাই জিজ্ঞেস করলো—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—এখানেই, সংক্ষেপে জবাব দিল ন্যাড়া।

কিন্তু সুরেন ছাড়লো না। বাড়িতে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলো —বললে না কোথায় ছিলে?

ন্যাড়া জবাব দিল—তপোবনে।

—তপোবন? অবাক্ হয়ে সুরেন প্রশ্ন করলো—সে আবার কোথায়?

—সে ভারী চমৎকার জায়গা। কিন্তু খুব ভয়ংকর জায়গাও বটে।

—মানে?

—ভয়ংকর সাপের আড্ডা সেখানে, ভেতরে ঢোকাই মুশকিল।

—তবে তুমি যে যাও।

—আমার কথা ছেড়ে দে।

সুরেন ছাড়ে না। 'তপোবন' সে দেখতে চায়। অগত্যা একদিন শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে যায় সেখানে। জঙ্গলের ওদিকে ঠিক গঙ্গার ওপারেই একটা জায়গা। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে, সেখানে বসানো হয়েছে বড় একটি পাথর। সেই পাথরটার ওপরে বসে নীরবে সাধনা করে শরৎচন্দ্র। মনকে একাগ্র করার চমৎকার জায়গাই বটে। সেই পাথরটার ওপর বসে গঙ্গা দেখতে কি চমৎকার লাগে। একবার বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু সত্যি বড় ভয়ংকর জায়গা। গা সিরসির করে। শরৎচন্দ্র কিভাবে যে এখানে আসতে সাহস করে সুরেন তা ভেবে পায় না। সাহস বটে দলপতির।

কিছুক্ষণ থেকেই সুরেন বলে—চলো, ফিরে যাই।

ন্যাড়া সব চেয়ে যেমন ভয় করে বড়দাদু কেদারনাথকে, তেমনি আবার সব চেয়ে ভালবাসে ন-দাদু অমরনাথকে।

অমরনাথ ছিলেন কেদারনাথের চতুর্থ ভ্রাতা। সরকারী চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন হাস্যপরিহাসপ্রিয় সহজ সরল মানুষ।

বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। সবাই মিলেমিশে এক সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলেন। গাঙ্গুলী পরিবার সত্যই এক আদর্শ বাঙালী পরিবার ছিল।

কেদারনাথ ছিলেন সবার বড়। তাঁর দুই ছেলে ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। কন্যা ভুবনমোহিনী।

মধ্যম অর্থাৎ মেজো ছিলেন অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা। তিনি বাস করতেন কলকাতার দুর্গাপিতুরি লেনে।

তৃতীয় অর্থাৎ সেজো ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। চতুর্থ অর্থাৎ 'ন' ছিলেন অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পঞ্চম ও শেষ অর্থাৎ ছোট ছিলেন অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মালদহে চাঁচল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

অমরনাথ বড়দাদা কেদারনাথের মত কড়া ছিলেন না বলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছেই সমস্ত আবদার ও বায়না করতো। সব ছেলেমেয়েরাই ছিল তাঁর ন্যাওটা।

অমরনাথ ছিলেন বই পড়ার বড় ভক্ত। মাঝে মাঝেই নানারকম বই নিয়ে আসতেন। আর আনতেন পকেট ভরতি লজেঞ্চুস।

অমরনাথ বাড়িতে ঢুকলেই ছেলেমেয়েরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরতো—লজেঞ্চুস—লজেন্স—

ন্যাড়ার কিন্তু লোভ থাকতো বইগুলোর দিকেই বেশী। সব বই সে পড়তে পারতো না। তবু বই উলটেপালটে দেখা ও নতুন কিছু শিখতে চেষ্টা করার ঝোঁক ছিল তার ভয়ানক।

ন্যাড়ার ওপর এজন্য অমরনাথের একটা ভাল ধারণা হয়েছিল। তিনি নতুন ভাল বই এলেই তাকে দেখতে দিতেন আর তার সঙ্গে দিতেন লজেঞ্চুস।

ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে বলতেন—ন-কাকা, তুমি ন্যাড়াকে বড় বেশী লাই দাও।

অমরনাথ একদিন বললেন—বইগুলি যদি নেড়েচেড়েই খুশী থাকে, তা থাক না। দীনবন্ধু, মাইকেল মধুসূদন এসব বইতো ও পড়তে পারে না।

ভুবনমোহিনী বললেন—বলো কি! ও সব বই কি ওর পড়ার বাকী আছে? ছোট মার ঘরে বই না পড়লে আর গল্প না শুনলে ওর কি পেটের ভাত হজম হয়?

ছোট মা মানে এ বাড়ির ছোট গিন্নী কুসুমকুমারী দেবী। স্বামী বাইরে থাকলেও তিনি এ বাড়িতেই থাকতেন বেশির ভাগ সময়। তাঁরও বই পড়বার বেজায় ঝোঁক ছিল। অমরনাথের সব বইয়েরই তিনি ছিলেন অংশীদার। রাত্রিবেলায় তাঁর ঘরে গল্পের আসর বসতো। ন্যাড়া ছিল তাঁর প্রধান শ্রোতা।

কেদারনাথ টের পেয়েছেন, বাড়ির ছেলেরা বড্ড বেশী বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। বাইরে বাইরেই থাকে বেশীক্ষণ। তাদের বাড়িতে আটকে রাখা দরকার।

তাই খুললেন চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেদের 'সান্ধ্য পাঠচক্র'। নিজেই পড়ান। সবাই তাঁকে ভয় করে, তাই অনুপস্থিত থাকতে সাহস পায় না কেউ।

ভয়ংকর কড়া মানুষ কেদারনাথ। নিজে যেমন ডিসিপ্লিন মেনে চলেন, তেমনি ছেলেদেরও ডিসিপ্লিন শেখান। সময়মত পড়তে বসতে হবে, সময়মত হবে ছুটি।

কাজেই যে সময়ে তারা এতদিন বাড়ি ফিরতো, তার অনেক আগেই এখন ফিরতে হচ্ছে। নইলে কি আর রক্ষা আছে।

বাইরে তারা দস্যি দামাল আর বাড়ি ফিরেই একেবারে শান্ত-শিষ্ট ভিজে বেড়াল। যতক্ষণ পাঠচক্রে আটক থাকে ততক্ষণ যেন থাকে তারা বন্দীশালায় বন্দী।

সবাই হাঁসফাঁস করে। মুক্তি পাবার উপায় খোঁজে।

কোন কোনদিন পাড়ার কয়েকজন সমবয়সী বৃদ্ধ আসেন কেদারনাথের কাছে। কোনো সামাজিক বা পাড়ার কোন গুরুতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। কেদারনাথ এ অঞ্চলের হোমরা-চোমরা লোক। কাজেই তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ অনেক ব্যাপারেই চাই।

সেদিন ছেলেদের কি মজা? বইপত্র গুটিয়ে তারা রীতিমত অভিনয় আরম্ভ করে দেয়। পাঠচক্র মুহূর্তের মধ্যে হয়ে ওঠে যাত্রার আসর। স্কেল হয় তলোয়ার আর বই হয় ঢাল। তারপর রাজায় রাজায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

সে এক দেখবার মত জিনিস বটে!

একদিন এমনিভাবে চলছে রামরাবণের যুদ্ধ। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন কেদারনাথ। পরামর্শ সভা কোন কারণে হলো না বলে তাড়াতাড়িই সেদিন ফিরে এলেন। এমন অঘটন ঘটবে ছেলেরা তা বুঝতে পারে নি। এ যেন বিনা মেঘে হঠাৎ বজ্রপতন।

কেদারনাথ হাঁকলেন—মুশাই! মুশাই!

ইয়া গোঁফওয়ালা দরোয়ান মুশাই গম্ভীরকণ্ঠে সাড়া দিল—বাবুজী!

সঙ্গে সঙ্গে আর এক অঘটন ঘটে গেল। ছেলেরা দাপাদাপি ও ছুটোছুটি করতে করতে ঘরের বাতিটাকে দিল ফেলে। অমনি আলো নিভে সারা ঘর অন্ধকার।

কেদারনাথ আরও জোরে হাঁকলেন—মুশাই! মুশাই!

মুশাই তখন তার বিরাট চেহারা নিয়ে তাঁর পাশেই হাজির। কেদারনাথ হুকুম দিলেন—এই ছোকরা লোককো কোচোয়ানকা ঘরমে কয়েদ রাখ্ দেও।

কেদারনাথ চলে গেলেন। আর সেই অন্ধকারে কে কোথায় পালিয়ে গেল দরোয়ান ধরতেও পারলো না। সবাই পালালো, ধরা পড়লো দেবেন। দেবেন কোচোয়ানের ঘরে বন্দী হলো।

আজ সারারাত তাকে বন্দী থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। হায় বেচারী! দোষ করলো সবাই আর ধরা পড়লো দেবেন।

ন্যাড়া আর মণি রাত্রি বেলায় চুপি চুপি তাকে খাবার পৌঁছে দিল। কলা আর মুড়ি।

দেবেন বললো—খাবার তো হলো। কিন্তু ঘুমোবো কি করে? বড্ড মশা যে এখানে।

ন্যাড়া বললো—আজ রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দে। কালকে ঘুড়ি ওড়াবো মজা করে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ন্যাড়া আর মণি পালিয়ে গেল। দেবেনকে অবশ্য কোচোয়ানের ঘরে রাত কাটাতে হলো না। কিছুক্ষণ পরেই কেদারনাথের হুকুমে সে মুক্তি পেল। রাত্রের খাবারও জুটলো তার ভাগ্যে। উপরি পাওনা হলো মুড়ি আর কলা।

নাঃ আর দুষ্টুমি করে বা ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করা চলে না। বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেছে। মন দিয়ে না পড়লে পরীক্ষার ফল ভালো হবে না। তখন দাদুর বকুনির ঠেলায় চারদিক অন্ধকার দেখতে হবে।

সত্যি পড়ায় মন দিল ন্যাড়া। সঙ্গে সঙ্গে সবাই। যেমন গুরু তেমন শিষ্য। তা ছাড়া পরীক্ষা তো সবারই।

যথাসময়ে বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেল।

এবার কিছুদিনের ছুটি। পড়ার হাত থেকে রেহাই।

লাটাই ঘুড়ি নিয়ে খেলার ধুম পড়ে গেল। তা ছাড়াও ন্যাড়ার খেয়াল যে অনেক। পাখি ধরা, ফড়িং পোষা, মাছ ধরা।

মাণিক সরকারের ঘাটে বুড়ো বটগাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে গঙ্গায় চান করার মজা কি কম! পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে সময়ও অফুরন্ত— লাফ দিয়ে, সাঁতার কেটে যেন আর শখ মেটে না।

চান করে ফেরার পথে ন্যাড়া তুলে আনে কচি ঘাস।

পথের লোকেরা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—এত কচি ঘাস দিয়ে কি করবে ন্যাড়া ?

ন্যাড়া জবাব দেয়—বাঃ, এগুলোই তো ফড়িংদের খাবার। এতগুলো ফড়িং, কম কচি ঘাসে চলবে কি করে ?

একা ন্যাড়ার যোগাড় করলে চলে না। দেবেন, মণি সবাই হাতে করে কচি ঘাস তুলে নিয়ে আসে। এনে ফড়িংদের বাক্সে ছড়িয়ে দেয়। আলাদা আলাদা বাক্সে আলাদা জাতের ফড়িং। কত বিচিত্র তাদের আকার, কত রকম তাদের রঙের বাহার।

শুধু কি ফড়িং! পাখিদের খাবার যোগাড় করতে হয়। অসুখ হলে করতে হয় চিকিৎসা। কোন্ পাতার রসের সঙ্গে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে কি প্রলেপ তৈরি করতে হয়, আদার রসের সঙ্গে নুন দিয়ে কোন্ রোগে পাখিকে খাওয়াতে হয় সব কিছু ন্যাড়ার জানা।

কিছুদিন আগে একটা কোকিল ধরা হয়েছিল। সেই কোকিলটার অসুখ।

তার জন্য ওষুধ খুঁজতে বের হলো ন্যাড়া। বনবাদাড় ঘুরে ওষুধ পেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তারপর রওনা হলো বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল মুশাই দরোয়ান সেদিকে আসছে। তাকে দেখে মুশাই বললো এ ন্যাড়াবাবু, জল্দি চলিয়ে, বড়াবাবু তোমকো বোলায়েছে।

ন্যাড়ার বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! দাদুর কাছে নিশ্চয়ই কেউ নালিশ করেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনে মনে আওড়াতে লাগলো—ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যুং রক্ষ রক্ষ স্বাহা—

হাত থেকে ওষুধের পাতা ফেলে দিয়ে ন্যাড়া বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে কেদারনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলো। বৈঠকখানা ঘরেই তিনি বসেছিলেন, আর বসেছিলেন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই।

হেডমাস্টারকে দেখে ন্যাড়ার বুকের ধুকপুকানি আরও বেড়ে গেল। সর্বনাশ, হেডমাস্টার আবার কেন? তার ভাগ্যে আজ কি আছে কে জানে? ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ—মন্ত্রটাও যেন গোলমাল হয়ে গেলো।

কেদারবাবু বললেন—ন্যাড়া, হেডমাস্টারমশাইকে প্রণাম করো।

ন্যাড়া দাদুর আদেশ পালন করলো। হেডমাস্টার তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন—তোমার দাদুকে প্রণাম করো। তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছো। শুধু তাই নয়, তুমি পেয়েছো ডবল প্রমোশন।

ঘাম দিয়ে যেন ন্যাড়ার জ্বর ছাড়লো।

বাড়ির সকলেই শুনলো ন্যাড়ার এই সাফল্যের সংবাদ। সবাই খুশী। মতিলাল ভুবনমোহিনীকে বললেন—দেখলে তো, যা বলেছিলাম তা সত্য কিনা! ন্যাড়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

চার

ভাগলপুর বাস অনেকদিন হয়ে গেল। কেদারনাথ স্থির করলেন কিছুদিন বাংলাদেশের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করবেন। তাই সপরিবারে চললেন হালিশহর।

মতিলালকেও স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ভাগলপুর ছাড়তে হলো।

আবার সেই দেবানন্দপুর। সেই পুরানো গ্রাম, সেই পরিচিত পথঘাট, পুকুর, বন, তবু যেন নূতন। মনে হয় এই ছয় বছরের মধ্যে যেন অনেক বদলে গেছে।

পথে দেখা হলো পিয়ারী পণ্ডিতের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র প্রণাম করলো। পিয়ারী পণ্ডিত বললেন--ভালো আছিস ন্যাড়া? অনেক বড় হয়ে গেছিস দেখছি।

খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই গাঁয়ের অনেকে ছুটে এলো। মতিলাল গাঁয়ে ফিরে এসেছে তাতে অনেকেই খুশী। প্রতিবেশী মেয়েরাও খুশী ভুবনমোহিনীকে পেয়ে।

পরদিন পথে ট্যাপার সঙ্গে ন্যাড়ার দেখা হয়ে গেল। সেই সর্দার পড়ুয়া ট্যাপা। ন্যাড়া জিজ্ঞেস করলো—কি রে ট্যাপা, চিনতে পারছিস?

ট্যাপা বললো—ন্যাড়া, তোরা আবার ফিরে এলি?

—হ্যাঁ, ফিরে এলাম। এখন কি করছিস?

—পড়াশোনা তো আর হলো না। বাবা বললো—বিয়ে থা কর, খেত খামার ছাখ্। কি আর করবো, তাই করছি।

গাঁয়ের অন্যান্য সব ছেলের খবরও দিল টঁ্যাপা। কথায় কথায় বললো—হ্যাঁ, শুনেছিস? পারুর বে হয়ে গেছে।

ন্যাড়ার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো। শুধু বললো তাই নাকি?

টঁ্যাপা বলতে লাগলো—কিন্তু কি দুঃখের কপাল মেয়েটার। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিধবা হলো। এখন কাশীতে না কোথায় থাকে।

ন্যাড়ার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না। সারাটা পথ পারুর কথা ভাবতে ভাবতেই চললো।

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভরতি হলো শরৎচন্দ্র।

গ্রামের সেই পুরানো সাথীদের অনেককেই সে ফিরে পেল। পিয়ারী পণ্ডিতের ছেলে কাশীনাথ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলেই পড়ছে, আরও দু'একজন পড়ছে সেখানে। অনেকে আবার পড়া ছেড়েও দিয়েছে।

এবার একজন নূতন সঙ্গী জুটলো—সদানন্দ। তার বাড়িতে প্রচুর জায়গা—খালি ঘর। সেখানে বসে তাসের ও দাবার আড্ডা।

আবার নূতন করে গড়ে উঠলো কিশোর বাহিনী—বদ ও বখাটে কিছু ছেলেও জুটলো সেই দলে। আবার শুরু হলো গাছের ফল ও পুকুরের মাছ চুরি, নিত্যনূতন দৌরাত্ম্য।

পাড়ার অনেকেই বলে—ন্যাড়াটা গাঁয়ে না এলেই ভালো হতো। ও-ই আবার এসে জোট পাকিয়েছে।

সেদিন দুপুর বেলা। ছুটির দিন। খুব জোর জমেছে তাস ও দাবার আড্ডা।

হঠাৎ দলেরই একজন এসে আড্ডাটা মাটি করে দিলে। খবর দিল—দত্ত বুড়োর কাল মেয়ের বিয়ে। অথচ নিমন্ত্রিত লোকদের কি খাওয়াবে তার যোগাড় নেই। বুড়োর যা টাকা ছিল তা মেয়ের বিয়েতে পণ দিতেই ফুরিয়ে গেছে।

—ইস্ বেচারী।

—অথচ সমাজের লোককে না খাওয়ালে বুড়োকে সবাই একঘরে করে রাখবে। শুনলাম, অনেক চেষ্টা করেও কালকের মাছ তরকারির টাকাও যোগাড় করতে পারে নি।

ন্যাড়া বললো—এখন খেলা বন্ধ কর্।

সদানন্দ বললো—হ্যাঁ, তাই হোক্।

তারপর সবাই মিলে বসে গেল প্ল্যান করতে। মাছ চুরি করতে হবে বড় পুকুর থেকে। আর তরিতরকারি চুরি করতে হবে বাগান থেকে। এ গাঁয়ের কিছু চুরি করা চলবে না, নইলে ধরা পড়তে হবে। আজ রাত্রেই অভিযানে যেতে হবে ভিন্ গাঁয়ে।

সব কিছু পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। সারা রাত ভরে চললো দুরন্ত তরুণ বাহিনীর অভিযান। রাত শেষ হতে না হতেই বুড়ো দত্তের বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে হাজির হলো তরুণ বাহিনী। তাদের হাতের থলিতে দু'তিনটে বড় রুই মাছ আর দু'তিন বস্তা ভরা তরিতরকারি।

দত্ত আর দত্তের গিন্নী দরজা খুলে তো হতভম্ব।

ন্যাড়া আর সদানন্দ তাঁদের অপরিচিত নয়। প্রথমে ভয় পেলেও পরে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা।

ন্যাড়া বললো—আপনার মেয়ের বিয়েতে এগুলো আমরা উপহার দিলাম।

দত্ত আর দত্তের গিন্নী কি ভাবে যে তাদের আশীর্বাদ করবেন ভেবে পান না।

মতিলালের ভাগ্যে বুঝি সুখ নেই।

ভাগলপুরে থাকতে কোন ভাবনা ছিল না। এখন সংসারের সমস্ত ঝামেলা তাঁর ওপর। বড় মেয়ে অনিলার বিয়ে দিতে হবে। সেজন্য টাকা পয়সা দরকার। পরপর দু'টি ছেলে হয়ে শিশুকালেই মারা গিয়েছে। এরপর আর এক ছেলে হয়েছে তার নাম প্রভাসচন্দ্র। নানা চিন্তা ভাবনায় মতিলালের মন বিব্রত।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মতিলাল বড়মেয়ে অনিলার বিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁতে তাঁর আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠলো।

ভুবনমোহিনী অনেক সময়ে সাহায্য পেতেন তাঁর বাবা কেদারনাথের কাছ থেকে। কিন্তু সে আশাও অন্তর্হিত হলো। হঠাৎ খবর এলো কেদারনাথ মারা গিয়েছেন। দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে আর ভাগলপুরে ফিরে যেতে পারেন নি।

পিতৃশোকে ভুবনমোহিনী অধীর হয়ে পড়লেন। মতিলালের মনেও শোকের আঘাত লাগলো।

সংসারের বোঝা টানতে টানতে দিনে দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন মতিলাল। আর বুঝি বইবার শক্তি নেই। কি হবে কে জানে?

পুরনো খাতাপত্র নিয়ে কি যেন লিখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখবার উৎসাহ আসে না। কিছুক্ষণ লিখে আবার বন্ধ করে দেন। পায়চারি করেন এদিকে ওদিকে—কখনো ঘরে, কখনো বারান্দায়, কখনো বা উঠোনে।

কিছুদিন ধরে সদানন্দের বাড়িতে আড্ডা জমে না আগের মতো।

ন্যাড়া আসে না। সদানন্দ চিন্তিত, চিন্তিত অন্যান্য সঙ্গীরাও।

ক'দিন ধরে ন্যাড়া স্কুলেও যায় না। কি ব্যাপার! তবে কি সে অসুস্থ?

চুপি চুপি একদিন ন্যাড়ার বাড়িতে এলো তার খোঁজখবর করতে। সামনাসামনি মতিলালের বা ভুবনমোহিনীর সামনে দাঁড়াবার সাহস তাদের নেই। কারণ মতিলাল বা ভুবনমোহিনী কেউই ন্যাড়ার এই সঙ্গীদের পছন্দ করেন না। সে খবর তারাও ভালভাবেই জানে।

গোপনে খবর নিয়ে জানলো, ন্যাড়া বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। শুধু খাবার সময় ছাড়া অন্য সময় খুব বেশী তাকে দেখা যায় না বাড়িতে।

সদানন্দ ও সঙ্গীদের মনে নানারকম সন্দেহ জাগতে লাগলো। তাহলে ন্যাড়া কোথায় যায়, কোথায় থাকে?

একদিন হঠাৎ সদানন্দের সঙ্গে রাস্তায় ন্যাড়ার দেখা হয়ে গেল। সদানন্দ জিজ্ঞেস করলো—একি ন্যাড়া, তুই স্কুলে যাস না কেন?

ন্যাড়া জবাব দিল—স্কুলে আর আমি যাব না।

—কেন? কি হয়েছে?

—মাইনে দিতে পারি না। অনেক মাসের মাইনে বাকী পড়েছে। বাড়িতে চাইলেও টাকা পাওয়া যায় না। কি করবো?

—কিন্তু বাড়িতেও তো থাকিস না বেশীক্ষণ। কোথায় থাকিস? কি করিস্?

—কি করবো! আখড়ায় গিয়ে সময় কাটাই। ওদের দলে মিশে গান করি। গান শিখতে পারলে হয় তো কিছু রোজগার হবে।

—এমন করে জীবনটা নষ্ট করছিস?

—কি আর করবো? তোদের সঙ্গে আড্ডা মারলে আর তাস খেললে কি জীবনটার উন্নতি হবে?

সদানন্দ আর কোন জবাব দিতে পারে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দেয়।

ন্যাড়াও পা চালিয়ে দেয় আখড়ার দিকে। আজ তার দেরি হয়ে গেছে। গিয়ে দেখে অধিকারী মশাই মুখ ভার করে বসে আছেন। ন্যাড়া কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ধমক দিয়ে বললেন—এত দেরি কেন চাঁদ? নাও ধরো--

একজন অপরদিক থেকে বলে ওঠে—গলাটা ভালো কিনা, তাই এত দেমাক।

বেজে ওঠে পাখোয়াজ—করতাল—দোতারা। গান ওঠে সমবেত সুরে।

বাড়ি ফিরে বকুনি খেতে হলো মতিলালের

মেজাজটা ভাল ছিল না। ন্যাড়াকে দেখেই বলে উঠলেন—পড়াশোনাও করবে না, কাজকর্মও করবে না, দরকার কি এমন ছেলে নিয়ে ?

ন্যাড়া জানে বাড়ির কি অবস্থা। বাবার মানসিক অবস্থার কথাও জানে। তবু কথাগুলি তার মনের মধ্যে গিয়ে বিঁধলো।

পরদিন ভোরবেলায় ন্যাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বেলা হয়ে গেল তবু আর বাড়ি ফেরার নাম নেই। চারদিকে খোঁজখবর করা হলো, তবু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সারাদিন এমন কি রাত্রিবেলায়ও বাড়ি ফিরলো না।

কেউ কেউ বললো—ন্যাড়াকে স্টেশনের পথে ঘুরতে দেখা গেছে।

কিন্তু সঠিক কিছু জানা গেল না। তবু বোঝা গেল ন্যাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে। কোথায় কে জানে।

ভুবনমোহিনী ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে আকুল হলেন। মতিলাল ক্ষোভে ও দুঃখে স্তব্ধ।

পাঁচ

ভাগলপুরের বাড়িতে কেদারনাথের ভাই অমরনাথ ভয়ানক অসুস্থ। দাদার মেয়ে ভুবনমোহিনীকে ছোট বেলা থেকেই তিনি খুব ভালবাসতেন। রোগশয্যায় শুয়ে তাঁর ইচ্ছা হলো ভুবনমোহিনীকে দেখবেন।

অমনি দেবানন্দপুরে টেলিগ্রাম করা হলো এবং ভুবনমোহিনীকে আনবার জন্য টাকাও পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ভুবনমোহিনীও কাকাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইলো এদিকে। ন্যাড়া নিরুদ্দেশ—তার খবর না জানা পর্যন্ত মনে মোটেই শান্তি পাচ্ছিলেন না।

পথ দিয়ে চলেছে এক ঘরছাড়া বাউল।

বয়সে তরুণ···সবে গোঁফদাড়ি উঠতে শুরু করেছে।

আপন মনে গান গায় আর ঘুরে বেড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, কখনো বা ছায়াঘেরা প্রান্তরে।

কি সুন্দর তার গান আর কি মধুর কণ্ঠস্বর। ছেলে যুবক বৃদ্ধ সকলেই গান শুনে মুগ্ধ হয়—ভিড় করে তার চারপাশে।

এই মধুর কণ্ঠস্বরই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এতদূরে—বাংলার নির্জন পল্লী থেকে উড়িষ্যার এই তীর্থক্ষেত্র পুরীতে। গাড়িতে

কোথাও তার টিকিট লাগে নি—টিকিট-পরীক্ষকরা গান শুনে তাকে আদর করেছে, কাজ ফেলে শুনে নিয়েছে একটির পর একটি গান। অনেকে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে টাকা পয়সা গুঁজে দিয়েছে তার জামার পকেটে, কেউ তার ক্ষুধার্ত মলিন মুখ দেখে আদর করে খেতে দিয়েছে।

এমনি করে চলছে তার দিনের পর দিন।

জগন্নাথ ধামে পুরীর মন্দিরের পাশে ঘুরে বেড়ায়! দেখে তীর্থ-যাত্রীদের মেলা আর দেখে মন্দিরের দেবতাকে। দেবতার দিকে তাকিয়ে নীরবে কি যেন প্রার্থনা জানায়!

ঘরছাড়া ভবঘুরের পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে···

ভুবনমোহিনী এলেন ভাগলপুরে তাঁর কাকার কাছে। শয্যায় শায়িত রোগে পাণ্ডুর কাকাকে দেখে চোখের জলে ভেসে যায় তার বুক। বাবার মৃত্যু শোকও বুকে উথলে ওঠে। তার ওপর ছেলের হারিয়ে যাওয়ায় দুঃখ···সব কিছু মিলিয়ে দুঃখে মুহ্যমান্ হয়ে পড়েন ভুবনমোহিনী।

অমরনাথ ভুবনমোহিনীকে সান্ত্বনা দেন। বলেন—জীবনে আমি কোন অন্যায় করি নি, কারুর মনে ব্যথা দেই নি, যাবার আগে এই প্রার্থনাই করে যাচ্ছি, ন্যাড়া আবার ঠিক তোর বুকে ফিরে আসবে।

অমরনাথের অন্তিম প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি। এক আশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়েই ন্যাড়া ফিরে এলো আর তার প্রিয় ন-দাদুর সঙ্গেও দেখাও হলো।

অনেকটা নাটকীয় ঘটনাই যেন।

কলকাতার নাম করা সলিসিটার গণেশচন্দ্র চন্দ্র পুরী থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরছিলেন। তিনি উঠেছিলেন গাড়ির উঁচু শ্রেণীর কামরায়।

ট্রেনে খুব ভিড় ছিল।

একটি ভবঘুরে ছেলে ভিড়ের জন্য অন্য কামরায় উঠতে না পেরে সেই কামরাতেই উঠে পড়লো। তার পোশাক মলিন, কিন্তু চেহারায় ভদ্রঘরের ছাপ।

গণেশচন্দ্রের কি রকম কৌতূহল হলো। তিনি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় যাবে খোকা?

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—যাবো এই কাছেই, তাড়াতাড়ি ভুলে এই কামরায় উঠে পড়েছি।

—তোমার নাম কি?

নামটা সে বলতে চাইছিল না। গণেশচন্দ্র বললেন—তোমার কোন ভয় নেই, নাম কি বলো না?

ছেলেটি সংকুচিত ভাবেই বললে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গণেশচন্দ্র তাকে হাত ধরে পাশে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন—অক্ষয়নাথ গাঙ্গুলী তোমার কেউ হন?

ন্যাড়া কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে রইলো। কিন্তু গণেশ-চন্দ্রের মনে হলো ছেলেটির সঙ্গে অক্ষয়নাথের চেহারার যেন কোথায় একটা মিল রয়েছে। তাই বললেন—তুমি নিশ্চয় বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ। চলো, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, কেউ কিছু বলবে না। অক্ষয়নাথ তোমার কে হন বললে না তো?

ন্যাড়া সলজ্জভাবেই জবাব দিল—আমার দাদু—মেজো দাদু।

অক্ষয়নাথ থাকতেন কলকাতার দুর্গাপিতুরি লেনে। তিনি ছিলেন গণেশচন্দ্রের বন্ধু। গণেশচন্দ্র ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপিতুরি লেনে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভাগলপুরে।

ভাগলপুরে অমরনাথের তখন অন্তিম অবস্থা। ন্যাড়া শেষ কয়েক-দিন তার প্রিয় ন-দাদুর কাছ ছাড়া হলো না।

অমরনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়লো। ১৮৯২ সাল। একই বছর নিষ্ঠুর নিয়তি কেড়ে নিল গাঙ্গুলী-পরিবারের দু'জন প্রিয় সন্তান—কেদারনাথ ও অমরনাথকে।
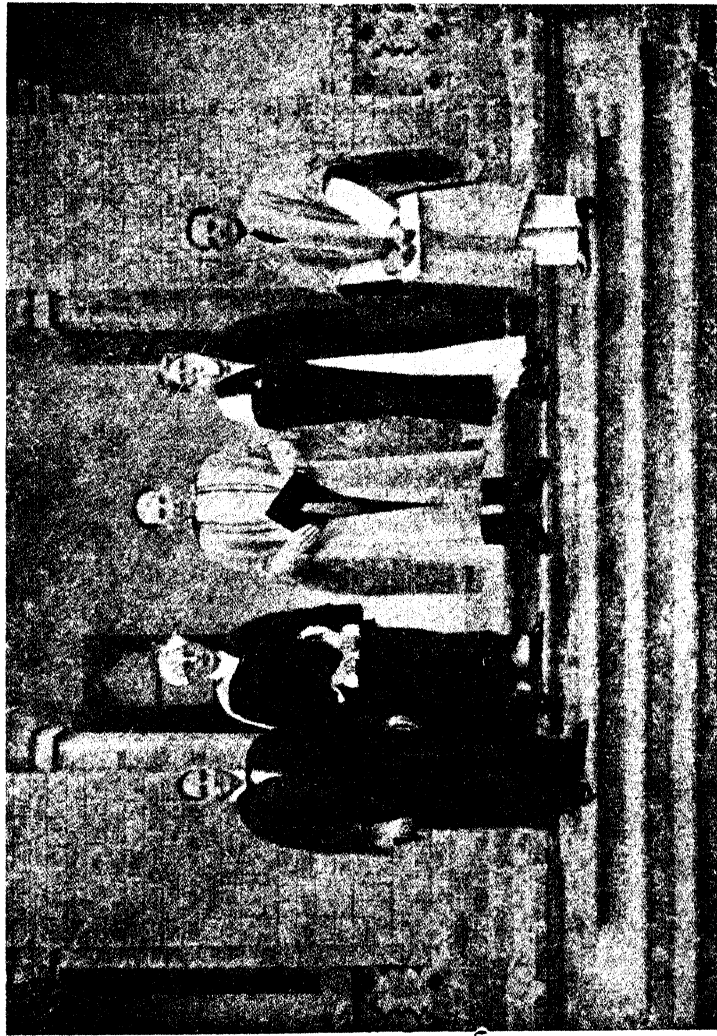
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্রকে 'ডি-লিট' উপাধি' দান উৎসবে স্যার যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র, গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ রহমান।

ছয়

ভুবনমোহিনী খুবই বিপদে পড়লেন।

বাবা, ন-কাকা মারা গেছেন। মেজো কাকা থাকেন কলকাতায়। সেজো কাকা মহেন্দ্রনাথ তখন ভাগলপুরের বাইরে। সংসারের সেই জমজমাট অবস্থা আর এখন নেই। কিভাবে শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া চলবে সেটাই হলো বিষম ভাবনা।

কেদারনাথের দুই ছেলে ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস—সম্পর্কে ভুবনমোহিনীর আপন ভাই। একদিন রাত্রে খেতে দিতে দিতে সামনে বসে বললেন—ন্যাড়ার পড়াশোনা কি হবে না? সে কি মূর্খ হয়ে থাকবে?

বিপ্রদাস বললেন—তুমি ভেবো না দিদি। আমাদের বংশের ছেলে মূর্খ হয়ে থাকবে, সে কি হয়? দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।

তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে সে সময়ে শিক্ষকতা করতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। চারুচন্দ্র বসু ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এঁদের সাহায্য ও সহানুভূতিতেই শেষ পর্যন্ত ন্যাড়া সেই স্কুলে ভরতি হতে পারলো।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার বাকী আর খুব বেশী দিন নেই। এর মধ্যেই তাকে তৈরী হতে হবে। বিপ্রদাস ন্যাড়াকে পড়াশোনার জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। বড় দাদুর ছোট পূজার ঘর। ঘরে একটি দড়ির খাটিয়া, তার নীচে স্টোভ, কেটলি, চায়ের সরঞ্জাম, জলের কুঁজো ও গ্লাস। একধারে একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার রয়েছে।

ন্যাড়া ভালোভাবে পড়াশোনায় মন দিল।

এবার স্কুলে ভরতি হয়ে পরিচয় হলো এক অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে। দুরন্ত ও দুঃসাহসী ছেলে। নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার—ডাক নাম রাজু।

রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার। ভাগলপুরের ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। প্রতিপত্তিশালী স্বাধীনচেতা পুরুষ। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। আদমপুর অঞ্চলে গঙ্গার ধারে কিনেছেন একটা পড়ো নীলকুঠি। সেখানেই প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেছেন।

তাঁরই ছেলে রাজেন। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, সুস্থ সবল চেহারা। মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। ভয় কি জিনিস তা সে জানে না। গায়ে যেমন শক্তি, মনে তেমনি সাহস।

রাজুর সঙ্গে ন্যাড়ার আলাপের কিছুদিন পরেই ভয়ানক বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, হলো সুখদুঃখের সঙ্গী।

পড়ার ঘরে ন্যাড়ার বই রাখার অসুবিধা ছিল বলে নিজের হাতে রাজু তৈরি করে দিল একটি শেল্‌ফ।

পরীক্ষা হয়ে গেল। এখন অফুরন্ত সময়।

শুরু হলো সঙ্গীসাথীদের নিয়ে আবার ছুটোছুটি, নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটা আর ব্যায়াম চর্চা। ভূতের বাড়িতে ব্যায়ামের আখড়া আবার গমগম করে উঠলো। আর 'তপোবন' তো রয়েছেই। ন্যাড়ার নিজের হাতে গড়া 'তপোবন'। ব্যবহার না করায় আগাছায় ভরতি হয়ে উঠেছিল। আবার সেগুলি নিজের হাতে পরিষ্কার করলো।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু'তিন মাস।

একদিন হাতে একটা কাগজ নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলেন বিপ্রদাস। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—দিদি, ও দিদি, মিষ্টি মুখ করাও। ন্যাড়া পাস করেছে।

সেদিনই ফল বেরিয়েছে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার। সবাই দেখলো শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

ভুবনমোহিনীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। ন্যাড়া প্রণাম করলো মা বাবাকে ও বাড়ির গুরুজনদের।

স্কুল ছেড়ে এবার কলেজ।

তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভরতি হলো ন্যাড়া। রাজুও পাস করেছে। সেও একই কলেজে ভরতি হলো।

একই সঙ্গে কলেজে যায়, ফিরেও একই সঙ্গে।

ন্যাড়া পড়াশোনায় ভালো, রাজুও খারাপ নয়। তবু অধ্যয়ন শুধু তাদের তপস্যা নয়। অন্যায়ের প্রতিকার করা ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করার দিকেও তাদের দৃষ্টি।

ন্যাড়ার চেয়ে রাজু কয়েক বছরের বড়। গায়ে শক্তিও বেশী। রাজু তাই কর্তৃত্ব ফলায় ন্যাড়ার ওপর। ন্যাড়া তা অম্লানবদনে মেনে নেয়।

রাজুর একটি ডিঙি নৌকা ছিল। সেই ডিঙি বেয়ে সে ঘুরতো এদিকে ওদিকে—যেতো গঙ্গার এপার থেকে ওপারে। নৌকো বাওয়ায় সে ছিল ওস্তাদ।

রাজুর সঙ্গে ন্যাড়া কোথায় চলে যেতো। সেদিন হয়তো ফিরতোই না। এসে হাজির হতো হয়তো পরের দিন অথবা দু'দিন পর। রাত্রে ডিঙিতে করে চলে যেতো জেলেরা যেখানে মাছ ধরে সেখানে। জেলে-ডিঙি থেকে চুরি করতো মাছ।

প্রথম যেদিন ডিঙিতে করে মাছ চুরি করতে গিয়েছিল, সেদিন ন্যাড়ার কি ভয়। ঘুরঘুট্টি রাত। শরবনের ভিতরে নৌকা গিয়ে ঢুকলো। জেলেরা যেখানে মাছ ধরে জিইয়ে রাখে সে জায়গা রাজুর জানা ছিল। সেখান থেকে মাছ তুলে আনতে কোনই কষ্ট হলো না। কিন্তু কাঁপতে লাগলো ন্যাড়ার গা।

ন্যাড়া বললো—রাজুদা, তোমার তো টাকা পয়সার অভাব নেই, তবু তুমি চুরি করো কেন?

রাজু ধমক দিয়ে বললো—আঃ চুপ কর্। টাকা পয়সা কি আমার আছে? টাকা পয়সা তো আছে আমার বাবার। তাতে আমার কি?

রাত ফরসা হয়ে এলো।

মেছোহাটার পাইকারদের দল ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। সেইখানে গিয়ে হাজির হলো ন্যাড়াকে নিয়ে রাজেন। সেখানে মাছ দিয়ে রাজু টাকাগুলো গুনে নিল।

ন্যাড়া বুঝতে পারলো না রাজু এতগুলো টাকা দিয়ে কি করবে।

রাজু তারপর চললো বাউরীপাড়ার দিকে। সেখানে গিয়ে ন্যাড়ার চক্ষুস্থির। এ অঞ্চলে সে আগে আসে নি। সারি সারি ভাঙা কুঁড়েঘর, তাতে বাস করে গরিব লোক। ছেলেমেয়ে আর বউগুলিকে দেখলেই বোঝা যায় ক'দিন ধরে এদের পেটে ভাত পড়ে নি।

রাজুকে দেখে কি তাদের আনন্দ! সবাই ছুটে এলো।

রাজু ঘুরে ঘুরে সবার ঘরে কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে দিল। বললো—তোরা সমানভাবে ভাগ করে নিবি। এবার কিন্তু আসবো অনেকদিন পরে।

ফিরবার পথে রাজু বললো—জানিস, ওরা বড্ড দুঃখী। মাঠে ঘাটে কাজ করে খায়, কিন্তু কাজ এখন ওদের নেই। তাই পেটে ভাতও পড়ে না।

ন্যাড়া কোন কথা বলে না। মনে মনে ভাবে—যতই দুরন্ত হোক, রাজুদার মনটা খুব বড়।

রাজুদার মনে কুসংস্কার বলে কিছু নেই। জাতের বিচার করে না। যেখানে সেখানে যার তার হাতে খেতে তার কোন আপত্তি নেই। শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হলো।

কিন্তু এদিকে হলো আর এক বিভ্রাট!

ন্যাড়া রাজুর সঙ্গে মিশে বাউরী পাড়ায় যায়। কোথায় কার অসুখ হয়েছে, যায় তার শুশ্রূষা করতে। সে কথা পাড়ায় রটে

গেল। ন্যাড়া বেপাড়া কুপাড়ায় যাতায়াত করে, যার তার হাতে খায়, সে ব্রাহ্মণের ঘরে কুলাঙ্গার।

এ নিয়ে কানাকানি শুরু হলো।

দর্পনারায়ণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ। সমাজের একজন মাতব্বর। নিষ্ঠার থেকে আচার তাঁর কাছে বড়। তিনি চরমপন্থীদের নিয়ে জোট বাঁধলেন। প্রচার করলেন—ন্যাড়া সমাজে পতিত। তার ছোঁয়া, কোন জিনিস তাঁরা খাবেন না।

গাঙ্গুলী বাড়িতে প্রতিবছর জাঁকজমক করে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। বহুলোক নিমন্ত্রিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে।

কিন্তু সেবারই ঘটলো বিভ্রাট।

দর্পনারায়ণের দল বসেছিলেন ভোজসভায়। হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন পরিবেশনকারীদের দলে রয়েছে ন্যাড়া। অমনি তাঁরা হই-হই করে উঠে গেলেন। পূজার আনন্দ যেন মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।

ভুবনমোহিনীর শরীর সেদিন ভাল ছিল না। অসুস্থ শরীর নিয়েই উঠে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে ন্যাড়াকে বললেন—ওরে! দেবতা, সমাজ, ধর্ম—তুই কি কিছুই মানবি নে? তুই একি হলি!

সে কথা শুনে ন্যাড়ার চোখেও জল গড়িয়ে পড়লো। মা তাকে বললেন—একটা কথা সব সময় মনে রাখিস, জীবনে যখন যে অবস্থাই আসুক না কেন, কখনো কাউকে দুঃখ দিস নে। সবাইকে ভালবেসে চলিস।

ছেলে ছন্নছাড়া উদাসী। যখন তখন বাড়ি ফেরে। এ নিয়ে বাড়িতে নানারকম কথা হয়। মতিলাল কিছু বলেন না। তিনি অসমর্থ। তাঁর বলার কোন ক্ষমতা বুঝি নেই। তাই চুপ করে থাকেন।

ভুবনমোহিনী অন্তরের জ্বালায় জ্বলে মরেন। বুঝতে পারেন, সংসারটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন পরেই চোখ বোজেন ভুবনমোহিনী দেবী।

শেষ হয়ে আসে ১৮৯৫ সাল।

সাত

মতিলাল স্থির করলেন—ভাগলপুরে গাঙ্গুলী বাড়িতে আর থাকবেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

তার ওপর ছেলের জন্য কথা শুনতে হয় নানা লোকের। এখানে না থাকাই ভালো।

গাঙ্গুলী বাড়ির পাট চুকিয়ে দিলেন মতিলাল। ভাগলপুর শহরের বাইরে খঞ্জরপুর গ্রামে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে চলে গেলেন।

ন্যাড়ার পড়াশোনার এইখানেই হলো ইতি।

বাড়ি ভাড়া তার ওপর সংসারের খরচ—কিছুতেই তাল সামলাতে পারেন না মতিলাল। অবশেষে শেষ সম্বল দেবানন্দপুরের বাড়ি ও বসত ভিটা মাত্র দুশো পঁচিশ টাকায় এক আত্মীয়ের কাছে বিক্রি করে দিলেন।

ন্যাড়ার খেলাঘর ভেঙে গেল। আবার জুটলো নূতন খেলাঘর।

খঞ্জরপুর থেকে আদমপুর বেশী দূরে নয়।

আদমপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ধনীই নন, শৌখিন ব্যক্তি।

বিলেতে যাওয়ার অপরাধে শিবচন্দ্র সমাজে একঘরে হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি দমে যান নি। নিজের চকমিলান বাড়িতে সমাজকে ভ্রূকুটি করে বিচ্ছিন্ন ভাবেই বাস করতন। তবু নিজেকে অসহায় বোধ করতেন না।

শিবচন্দ্রের একমাত্র সন্তান কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদমপুর ক্লাব। শিবচন্দ্রের বাড়িতেই ছিল ক্লাব। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা, নকসা-কাটা ফুলদানিতে

নানারঙের ফুলের বাহার। দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো। ঘরের একপাশে নানারকম খেলাধূলার সরঞ্জাম।

সমাজের নিন্দা ও কটূক্তি উপেক্ষা করে স্থানীয় এবং আশেপাশের তরুণদল নিয়মিত সেই ক্লাবে যাতায়াত করতো।

খেলাধূলা ছাড়াও ক্লাবের একটা বড় আকর্ষণ ছিল গানবাজনা ও নাটক। ন্যাড়া ছিল সতীশচন্দ্রের বন্ধু। তাই ন্যাড়াও আদমপুর ক্লাবে ভিড়ে পড়লো। লেখাপড়া চুলোয় গেছে, এখন থিয়েটার ও গানবাজনা নিয়েই সে মেতে উঠলো।

রাজু ভাল বাঁশী বাজাতে পারতো। অভিনয়ও করতে পারতো ভালো। কাজেই সেও ক্লাবে ভরতি হয়ে গেল।

বেশ জাঁকজমক করে অভিনীত হলো 'জনা'। ন্যাড়াকে তাতে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হলো। কারণ মেয়ের মেকআপ করলে তাকে খুব ভাল দেখাতো। আর গলার স্বরটাও ছিল অনেকটা মেয়েলী। তাই খুব ভাল হলো জনার অভিনয়। ন্যাড়ার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর ধুমধাম করে শুরু হলো 'বিল্বমঙ্গল' পালার মহড়া। চিন্তা-মণির ভূমিকায় ন্যাড়া আর 'পাগলিনীর' ভূমিকায় রাজু। কি সুন্দর পাঠ করছে ওরা। ক্লাবের সবার মনে খুব উৎসাহ, 'বিল্বমঙ্গল' 'জনা'র চেয়েও ভালো হবে।

নির্দিষ্ট দিনে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হলো। দর্শকের জায়গা লোকে লোকারণ্য। অভিনয় দেখবার জন্য লোকের মনে কি কৌতূহল!

অভিনয় শুরু হলো। কি চমৎকার, কি সুন্দর অভিনয়! ধন্য আদমপুর ক্লাব। শাবাশ শরৎচন্দ্র, শাবাশ রাজেন! করতালির ধ্বনিতে আসর যেন ফেটে পড়তে চায়।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। অনেকেই খুঁজছে ন্যাড়া আর রাজুকে। তাদের দু'জনকে অভিনন্দন জানাবে।

ন্যাড়াকে তো পাওয়া গেল। কিন্তু রাজুর দেখা নেই। কোথায় গেল রাজু? সে কি কাউকে কিছু না বলেই বাড়িতে চলে গেল? অদ্ভুত ছেলে তো!

কিন্তু কি আশ্চর্য! পরদিনও রাজুর দেখা পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। মাসের পর মাস কেটে গেল, বছরের পর বছর। আর কোনদিন রাজু ফিরে আসে নি। তার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা রহস্যপূর্ণ ই রয়ে গেল সকলের কাছে।

ন্যাড়ার জীবনেরও সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। ঘরে শান্তি নেই, বাইরে শান্তি নেই, সব সময়েই কেবল মনে হয় রাজুদার কথা। সব কিছুর মধ্যেই যেন জড়িয়ে আছে রাজুদার স্মৃতি।

পুরনো সঙ্গীরা এখন আর নেই। এখন সে চলে গেছে ভাগলপুর থেকে অনেকটা দূরে। পুরনো সঙ্গীদের পেলেও মন আর তাতে ভরে না। এখন সে যেন অন্য মানুষ।

এদিকে ওদিকে আপন মনে ন্যাড়া ঘুরে বেড়ায়। গঙ্গার বুকে নৌকো দেখলে চোখে জল আসে। এখন আর নেই সেই ভূতের বাড়িতে ব্যায়ামের আখড়া আর নির্জন তপোবন।

ঘুরে ফিরে বাড়িতে আসতেই মতিলালের রুক্ষ স্বরে ন্যাড়ার চেতনা জাগে। মতিলাল বলে ওঠেন—কোথায় ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল এতক্ষণ ?

ন্যাড়া কোন কথা বলে না। চুপ করে ঘরে ঢুকে পড়ে।

মতিলালের কণ্ঠ আরও তীক্ষ্ণ হয়। বলেন—অনেক বিদ্যাই তো শিখেছ। চুরি বিদ্যাটি আবার কবে শিখলে ?

চুরি বিদ্যা! চমকে উঠে ন্যাড়া বাবার দিকে তাকায়।

মতিলাল বলেন—হ্যাঁ, চুরি বিদ্যা। আমার বাক্সে যে কয়েকটা দামী পাথর ছিল সেগুলো কোথায়? জানো না, আমার হাত খালি। শেষ সম্বল ঐ পাথর ক'টি বিক্রি করেই এখন কিছুদিন চালাতে হবে।

ন্যাড়াও সে কথা শুনে পাথর হয়ে যায়।

মতিলাল জিজ্ঞেস করেন—বাক্স খুলে সেই পাথরগুলো নিয়েছিস তুই ?

ন্যাড়া কি করে বলবে তার এক বন্ধুকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সে ওগুলো বাঁধা দিয়েছে। ভেবেছিল, কিছুদিন পরে সেগুলো ছাড়িয়ে আনবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়ে ওঠে নি।

মতিলাল বুঝতে পারলেন, ন্যাড়াই এই কাণ্ড করেছে। তিনি অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। আমি আর তোর মুখ দেখতে চাই নে।

বেরিয়ে গেল শরৎচন্দ্র। খিদে লেগেছিল, খাওয়াও হলো না। বিশ্রাম করবে ভেবেছিল, সেই বিশ্রাম নেওয়াও হলো না। এক জামা কাপড়ে নিঃসম্বল অবস্থায় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মতিলাল কিছু বললেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মত।

অনেকদিন পর দেখা গেল শরৎচন্দ্রকে। তখন সে অন্য মানুষ। পরনে গেরুয়া। হাতে লাঠি। মাথা আর মুখ জুড়ে সন্ন্যাসীর চুল দাড়ি। কাঁধে ঝোলা।

গ্রাম থেকে গ্রামে, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরে বেড়ায় নবীন সন্ন্যাসী। বিভিন্ন আশ্রমে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে যায়। তারপর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হয় মজঃফরপুর ধর্মশালায়।

ধর্মশালায় থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে এসে উপস্থিত হয় শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শিখরনাথের স্ত্রী অনুরূপা দেবী বিখ্যাত লেখিকা।

সেই বাড়িতে বসে সাহিত্য ও গান-বাজনার আসর। সেই আসরে একদিন নবীন সন্ন্যাসীর গান খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। শিখরনাথ ছিলেন গানের ভক্ত। তাই তিনি শরৎচন্দ্রের অনুরাগী হয়ে পড়েন।

শরৎচন্দ্রের আরো অনেক গুণ ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সেই বাড়িতেই একদিন এসে হাজির হলেন রাজা মহাদেব সাউ। তিনি গান-বজনা ও শিকারের ভক্ত। শরৎচন্দ্রের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে বিলাস ব্যসনের মধ্যে শুরু হলো নূতন জীবন।

কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি।

অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব শখ ছিল।

তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন—একটি বাঙালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়। অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন। কিন্তু তা নয়, লোকটা বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসবো তাকে। গান শুনবে? তার খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে ভালো হয়।

বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা এক-একদিন, ভালো কোন গায়ক পাওয়া গেলে গান-বাজনার আসর বসিত।

নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসেন।

ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ির অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কিজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল।

শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু (লেখিকার স্বামী) এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটি স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।"

রাজা মহাদেব সাউর চকমেলান বাড়ি। জলসাঘরে ঝাড়লণ্ঠনের তলায় রঙীন গালিচা। বাজনদারের দল বসে নানা যন্ত্র নিয়ে।

মহীশূর চন্দনের ধূপের গন্ধে ঘর ভরপুর।

রাজাসাহেব আসেন আতরের গন্ধ আর পানের জর্দার গন্ধ

ছড়িয়ে। শুরু হয় বাজনার ঐকতান। ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে আসে লক্ষ্ণৌর বাঈজী।

নাচের আসর জমে যায়।

আবার জমে গানের আসর।

শরৎচন্দ্র সেই আসরের নিত্য সঙ্গী। রাজা সাহেবের প্রিয় শরৎচন্দ্র শুধু নাচ গানের আসরেই নয়, শিকারেও সঙ্গী।…এমনি করে কাটে বৈচিত্র্যময় দিন।

দেখতে দেখতে এসে যায় ১৯০৩ সাল।

অকস্মাৎ শরৎচন্দ্রের কানে খবর এলো, পিতা মতিলাল আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করেছেন।

ঝাড়লণ্ঠনের বাতিগুলি যেন তাঁর চোখের সামনে এক ফুৎকারে নিভে গেল…সংগীতের মীড়মূর্ছনা গেল স্তব্ধ হয়ে।

মজঃফরপুর থেকে শরৎচন্দ্র চলে এলেন খঞ্জরপুরে।

এসে দেখেন সংসারের অসহায় অবস্থা। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই সংসারের ভার শরৎচন্দ্র নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু এ ভার তিনি সইবেন কেমন করে?

পিতার পারলৌকিক কাজ করলেন। আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখলেন।

ছোটবোন মুনিয়ার ভার নিলেন খঞ্জরপুরের বাড়িওয়ালার স্ত্রী। মুনিয়াকে তিনি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন। মধ্যমভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের ভার নিলেন আসানসোলের এক আত্মীয়। ছোট ভাই, প্রকাশচন্দ্রের আশ্রয় মিললো জলপাইগুড়িতে ছোট দাদু অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

এবার শরৎচন্দ্র মুক্ত।

সংসারের আর কোন বন্ধন নেই।

এলেন কলকাতায়। কোন কিছুই ভাল লাগলো না। হঠাৎ খেয়ালের বশে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়ে চললেন রেঙ্গুনের দিকে।

আট

শরৎচন্দ্রের উদাসীন মন। ছন্নছাড়া জীবন।

ছন্নছাড়ার মতই রেঙ্গুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

১৯০২ সাল।

অপরিচিত জায়গা রেঙ্গুন। কোথায় গিয়ে উঠবেন? তাঁর মত লোককে চাকরিই বা দেবে কে?

একমাত্র ভরসা রেঙ্গুনের খ্যাতনামা উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস হালিশহর, থাকেন রেঙ্গুনের লিউউইস স্ট্রীটে। সম্পর্কে মেসোমশায়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের খুড়তুতো মামা। উপেন্দ্রনাথের সহোদরা ভগিনী অন্নপূর্ণা দেবীকে অঘোরনাথ বিয়ে করেছেন। রেঙ্গুনে গিয়ে বেশ পসার জমিয়ে তুলেছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র সেই বাড়িতে গিয়েই উঠিলেন। অঘোরনাথ ছিলেন অতিথিবৎসল ও অমায়িক লোক। অন্নপূর্ণা দেবীর স্বভাবও ছিল অতি মধুর। কাজেই শরৎচন্দ্রের কোন অসুবিধা হলো না। সেই বাড়িতে থেকেই চাকরির খোঁজ খবর করতে লাগলেন।

অঘোরনাথও চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরই চেষ্টায় বর্মা রেলওয়ের এজেন্ট জনসন সাহেবের অফিসে পঁচাত্তর টাকা বেতনে শরৎচন্দ্রের একটি চাকরি ঠিক হলো।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই হলো এক বিভ্রাট। অঘোরনাথ নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন।

অন্নপূর্ণা দেবী তখন রেঙ্গুনে নেই। কন্যার বিয়ের ব্যবস্থার জন্য কলকাতায় গিয়েছেন। এই সময়ে ঘটলো এই বিপদ।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, বিভুঁই বিদেশে কে সেবাশুশ্রূষা করবে? যুবক শরৎচন্দ্র কোমর বেঁধে মেসোমশাইয়ের সেবা শুশ্রূষায় লেগে গেলেন। দু'জন বিশিষ্ট বাঙালী চিকিৎসককে দেখানো হলো।

রোগীর যত্ন এবং সময়মত ঔষধ খাওয়ানো খুবই প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র চেষ্টার ক্রুটি করলেন না। তাঁর স্নান খাওয়া প্রায় বন্ধ হলো। এই কাজে এগিয়ে এলেন আরও একজন। তিনি গিরীন্দ্রনাথ সরকার। ভূপর্যটক ও সরকারী কনট্রাক্টর। অঘোরনাথের বন্ধু। তিনিও অক্লান্তভাবে রোগীর সেবা যত্ন করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিষ্ঠুর মৃত্যু অঘোরনাথকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র আবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেন। চাকরিতেও যোগ দেওয়া হলো না। বাউল সন্ন্যাসীর মত উত্তর ব্রহ্মের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু আর এক জায়গায় মিললো তাঁর প্রীতির আশ্রয়। অঘোরনাথের রোগশয্যায় যিনি তাঁর সহায়ক ছিলেন, সেই গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হলো। শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর এবং ছিল ভাবপ্রবণ দরদী মন। এই সদ্‌গুণ গিরীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করলো।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যতদিন ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অটুট ছিল, প্রায় সব কাজেই দু'জন ছিলেন দু'জনের সঙ্গী।

শরৎচন্দ্র গান গাইতে পারতেন ভালো। অথচ তিনি এত গোপন-স্বভাব ছিলেন যে বাইরের লোক তা জানতে পারতো না। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের কাছে তা গোপন থাকতে পারে নি।

সুকণ্ঠ গায়ক শরৎচন্দ্রকে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের শিকারেও খুব শখ ছিল। এ কথাও জানতে পেরেছিলেন

গিরীন্দ্রনাথ। তাই একদিন কথায় কথায় শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, জানো শরৎদা, পেগুতে আমার অনেক বন্ধু আছেন এবং নানারকম শিকারের সুযোগও সেখানে আছে। পুকুরে আছে অনেক মাছ, আশে-পাশের জঙ্গলে মেলে ছোট ছোট হরিণ। তা ছাড়া প্রচুর পাখিও পাওয়া যায়। যাবে নাকি সেখানে?

ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের মন নেচে উঠলো। তা ছাড়া তিনি তখন বেকার। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

পেগুতে গিরীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন শ্রীসরকার। তাঁর বাড়িতেই প্রথমে দু'জনে উঠলেন। সেখানে কয়েকদিন কাটানোর পর গেলেন শ্রীচ্যাটার্জীর বাড়িতে।

শ্রীচ্যাটার্জীও ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। নামকরা উকিল।

গিরীন্দ্রনাথ পেগুতে এসেছেন অনেকবার। কিন্তু শরৎচন্দ্র কখনও আসেন নি। তাই গিরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখাবার জন্য। পেগু নদীর পরপারে এক মাইল দূরে এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। লম্বায় প্রায় ১২০ ফুট। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এই মূর্তিটি দেখবার জন্য আসে অসংখ্য মানুষ।

তা ছাড়াও পেগুতে দেখবার মত আছে অসংখ্য প্যাগোডা, ফুঙ্গী ও পাহাড়ী কুকুর। শরৎচন্দ্র এর আগে বর্মার পল্লীগ্রাম কখনো দেখেন নি। এসব দেখে তিনি সত্যি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। আরও বিস্মিত হয়েছিলেন পেগুর সুবৃহৎ সোয়েমড প্যাগোডার শীর্ষদেশে নীল আকাশ ভেদ করে সূর্যকিরণ ঝলমল করতে দেখে।

একদিন পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়া হলো। রসুল বক্সের পুকুর। বড় মাছ ধরতে হলে বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। কিন্তু এত ধৈর্য শরৎচন্দ্রের ছিল না। তাই গিরীনবাবু বললেন—শরৎদা, তুমি পুঁটি মাছ ধরো।

শরৎচন্দ্র তাই করলেন। প্রতি টোপে কোনবার একটি কোনবার দু'টি করে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো মাছ ধরা হয়ে গেল।

গিরীনবাবু বসেছিলেন হুইলের ছিপ নিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর

সেই ছিপে একটি বড় মাছ টোপ গিললো। পুকুরের মাঝখান অবধি মাছটি সুতো টেনে নিয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কিনারের দিকে টেনে আনতে গিয়ে মাছটি গেল পালিয়ে।

শরৎচন্দ্র বললেন—গিরীন চল, আজ আর কিছু হবে না। বঁড়শি-পালানো মাছটা এতক্ষণ গিয়ে তার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে, কাজেই আর কি মাছ আসবে?

এমন সময় দু'জন বর্মি মেয়ে এসে শরৎচন্দ্রকে বর্মা ভাষায় জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি মাছ বিক্রি করবে?

শরৎচন্দ্র বর্মা ভাষা জানতেন না। তাই গিরীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—এরা কি বলছে?

গিরীনবাবু বললেন—এরা মাছ কিনতে চায়।

শরৎচন্দ্র রাগতভাবে বলে উঠলেন—আমরা কি জেলে যে মাছ বিক্রি করবো?

গিরীনবাবু বললেন—তুমি তো জানো না, এ দেশের রীতিনীতিই আলাদা। বঁড়শি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মাছ ধরা বর্মিজরা মোটেই পছন্দ করে না। এদেশে অহিংসা পরম ধর্ম। এরা জীবন্ত মাছ কখনও মেরে খায় না। এ দেশের পথে-ঘাটে বাজারে কোথাও জীবন্ত মাছ বিক্রি হতে দেখবে না। কই মাগুর মাছ পর্যন্ত বিদেশী জেলেরা মেরে বাজারে নিয়ে আসে। বর্মিজরা ভারী দয়ালু জাত। মেয়েরা জ্যান্ত মাছ কিনে পুকুরে ছেড়ে দেয়। মেলাতে গিয়ে ব্যাধের কাছ থেকে পাখি কিনে উড়িয়ে দেয়।

শরৎচন্দ্র তা শুনে খুশী হয়ে বললেন—বাঃ, বেশ তো! আমি গোটাকতক মাছ ওদের এমনি দিয়ে দিচ্ছি।

গিরীনবাবু বললেন—এমনি দিলে ওরা নেবে না।

তখন কি করা যায়! শরৎচন্দ্র মাছ বেচতে রাজী হলেন। পয়সায় দুটো হিসাবে মাছের দর ঠিক হলো। কুড়িটি মাছ বিক্রি করে শরৎচন্দ্র দশটি পয়সা হাতে নিয়ে বললেন—যাক, এক প্যাকেট সিগারেটের দাম তো হলো।

পরদিন বিকেলে আবার রসুল বক্সের পুকুরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, পুকুরের বাঁধানো ঘাটটিতে একজন ইউরোপীয়ান সাহেব বসে বসে মাছ ধরছেন। ছিপটি বিলিতি, সঙ্গে আছে একটি বন্দুক, একজন বয়, একটি স্যুটকেস এবং আরও অনেক সরঞ্জাম। সাহেব ফাতনার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছেন।

তাঁরা তখন ঘাটের অন্যদিকে গিয়ে বসলেন। শরৎচন্দ্র আজ বসলেন হুইলের ছিপ নিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই একটি বড় মাছ ধরে ফেললেন। সাহেবের তা দেখে চক্ষুস্থির! তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলে উঠলেন--আপনার কি ভালো ভাগ্য!

শরৎচন্দ্র অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সাহেব, আপনি এমন সুন্দর বাংলা কথা শিখলেন কি করে?

সাহেব বললেন—আমি অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম। আপনি খুব লাকি, বসবামাত্রই এত বড় মাছটা ধরে ফেললেন। আর আমি সকালের ট্রেনে রেঙ্গুন থেকে এসে একটি ছোট মাছও ধরতে পারি নি। আজ যদি আমি মাছ নিয়ে না যাই তা হলে মেম সাহেব আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

সাহেব বললেন—এত দূরে টাকা খরচ করে আসতে মেম সাহেব মানা করেছিল। আমি বলে এসেছি আজ নিশ্চয়ই একটা মাছ ধরে আনবো।

সে কথা শুনে শরৎচন্দ্রের মনে সহানুভূতি জাগলো। তিনি বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটা নিয়ে যান।

সাহেব বললেন—কুড়ি পাউণ্ড ওজনের অত বড় মাছ নিয়ে আমি কি করবো? আমি শুধু নিজে ধরেছি বলে মেম সাহেবকে মাছটি একবার দেখিয়ে আপনাকে ফেরত দেবো। রেঙ্গুন স্টেশনে আমার গাড়ি আসবে, চলুন একসঙ্গে যাই।

সাহিত্যের দুই মহারথী—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র
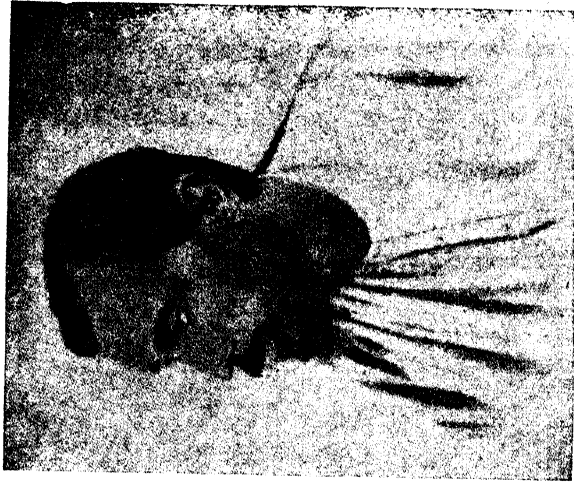
'চরিত্রহীন' রচনাকালে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বললেন—আমরা রেঙ্গুনে যাবো না, আমরা তো পেগুতে থাকি।

সাহেব বললেন—মিঃ সরকারকে আমি জানি, উনি তো রেঙ্গুনের লোক। ফেয়ার স্ট্রীটে ওঁর এঞ্জিনিয়ারিং ও কনট্রাক্টারের অফিস আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে কথা ঠিক। কিন্তু উপস্থিত আমরা পেগুর উকিল মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতে আছি, দু'তিন দিন পরে ফিরবো। আচ্ছা সাহেব, আপনার এত মাছ ধরবার ঝোঁক হলো কেন?

সাহেব বললেন—মাছ ধরা আমার নেশা। মেমসাহেব বলেন, আমি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই জেলে ছিলাম।

তারপর শরৎচন্দ্রের উদারতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তিনি মাছটি নিয়ে গেলেন এবং যাবার সময় দু'খানি কার্ড দিয়ে গেলেন। কার্ডে লেখা ছিল—Charles A. Cones, Secretary, Burma Chamber of Commerce, Rangoon.

পরে এই কোনস সাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও গিরীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে মাঝে মাঝেই মাছ ধরতে যেতেন। সেই সূত্রে মেম সাহেবের সঙ্গে তাঁদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মেমসাহেব বহুবার চায়ের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের নিজের হাতের তৈরী কেক পুডিং প্রভৃতি বিশেষ আদর যত্নের সঙ্গে খাওয়াতেন। মিসেস কোনস বড় মাছ ধরা হয়েছে দেখলে খুব খুশী হতেন এবং ছোট একটি টুকরা কেটে নিয়ে বাকী সব মাছটা তাঁদের দিয়ে দিতেন।

মাছ ধরার শখ মিটলো। এবার শিকারের পালা। একদিন শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে বের হলেন কাছাকাছি জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে। সঙ্গে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জীর বন্দুক। পথ প্রায় জনশূন্য। দু'দিকের সারি সারি ঘন সেগুন বন ছাড়িয়ে তাঁরা ঢুকলেন ঘন কাঁটার ঝোপের মধ্যে। দাঁড়িয়ে যাবার উপায় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকতে গিয়েও তাঁদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে হু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। এমন সময় পায়ের কাছে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে চমকে উঠলেন তাঁরা। গিরীন্দ্রনাথ দেখলেন, একটি প্রকাণ্ড গোখুর সাপ, হু'টি পাথরের ফাঁক দিয়ে ফণা তুলে আছে।

কি ভয়ংকর অবস্থা! গিরীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোরে সাপের মাথার উপর আঘাত করলেন। তারপর—শরৎদা, সাপ! সাপ! পালাও, বলে দিলেন জোরে ছুট।

শরৎচন্দ্রও কই কই, কি সাপ! বলে চিৎকার করতে করতে প্রাণপণে দৌড় দিলেন। ঝোপের কাঁটা লেগে তাঁর শরীরের অনেক স্থান রক্তাক্ত হয়ে গেল। বাইরে নিরাপদ স্থানে এসে বললেন—সাপটি কি জাতের ভাল করে দেখলে হতো।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—না দেখেই তোমার এই অবস্থা, দেখলে কি তোমায় খুঁজে পাওয়া যেতো।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হে। শুনেছি এদেশে খুব বড় বড় কিং কোবরা ও শঙ্খচূড় সাপ আছে।

গিরীন্দ্রনাথের গা তখনও কাঁপছিল। তিনি বললেন—আমি বনে জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি, কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড সাপ দেখি নি। আজ ভগবান রক্ষা করেছেন।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, তুমি তো বিশ বছর এদেশে আছ, বর্মিদের মধ্যে সাপুড়ে বা বেদে দেখেছ কি?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—না, এদেশে সাপুড়ে সব বিদেশী পাঞ্জাবী। অবশ্য বর্মিজরাও অনেক ওষুধ জানে, হাতে করে সাপ ধরতে পারে।

হঠাৎ তাঁরা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তলোয়ারের মতো লম্বা ধারালো দা হাতে নিয়ে একটি বর্মিজ রাখাল ছেলে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদেশের ছোট বড় সবাই লম্বা দা হাতে না নিয়ে ঘরের বের হয় না। অন্ধের লাঠির মত এটা তাদের সঙ্গের সাথী। শরৎচন্দ্রের গায়ে রক্তের দাগ দেখে ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো—এত রক্ত কেন?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—আমাদের একটা সাপে তাড়া করেছিল।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো—কোথায় সাপ?

—ঐ তো সামনের ঐ জঙ্গলের মধ্যে।

ছেলেটি জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললো—আমি যদি ঐ সাপটিকে এখনই ধরে এনে দিতে পারি, কত বকশিশ দেবেন?

শরৎচন্দ্র সে কথা শুনে যেমন খুশী হলেন তেমনি আশ্চর্যান্বিতও হলেন খুব। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কত চাও?

ছেলেটি বললো—পাঁচ টাকা।

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, তাই দেবো।

কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি জঙ্গল থেকে সেই প্রকাণ্ড গোখুর সাপটিকে ধরে এনে সেখানে হাজির হলো। সাপের মুখটি তার হাতের মুঠোয়, কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপটি তার সমস্ত হাতটিকে জড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠলেন—উঃ, এত বড় সাপ কেমন করে হাত দিয়ে ধরলে বল তো?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—যেমন করেই ধরুক, এখন তুমি পাঁচটি টাকা বের করো।

শরৎচন্দ্র ঝোঁকের মাথায় কথাটি বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু টাকা দেবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তা ছাড়া তিনি কিছুতেই ধারণা করতে পারেন নি, ছেলেটি সত্যি সত্যি জীবন্ত গোখুর সাপ ধরে আনবে।

যা হোক, দুটি টাকা দিয়ে ছেলেটিকে খুশী করা হলো। সে তাঁর বাঁ হাতের কবজির মধ্যে একটি সেলাইয়ের দাগ দেখিয়ে বললো—এর মধ্যে গাছের শিকড় আছে, সেই দ্রব্যগুণেই তো সাপ ধরতে পারি।

শরৎচন্দ্র এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা নিয়ে সেদিন ফিরলেন।

গিরীন্দ্রনাথ বিশেষ কাজে রেঙ্গুন চলে এলেন। অবশ্য সামান্য কয়েক দিনের জন্য। পরের সপ্তাহে শনিবারে রেঙ্গুন থেকে পেগু স্টেশনে এসে তিনি দেখলেন—শ্রীচ্যাটার্জী, শ্রীসরকার, শ্রীঘোষাল ও শরৎচন্দ্র তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। ঐ ট্রেন থেকেই শ্রীমণীন্দ্রকুমার

মিত্র সপরিবারে সেই স্টেশনে নামলেন। ডেপুটি এগজামিনার শ্রীমিত্রকে দেখে সকলেই অবাক্। শ্রীমিত্র বললেন, তিনি একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে হিসাব পরীক্ষা করতে এসেছেন। স্থানীয় ইনস্‌পেকসন বাংলোয় তিনি উঠবেন।

শ্রীচ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ বিনিময় হল্লো। অতিথিবৎসল ও বন্ধু-বৎসল শ্রীচ্যাটার্জী শ্রীমিত্রকে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। শ্রীমিত্র তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

এই নবাগত অতিথিদের উপলক্ষ করে মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতে সেই রাত্রে একটি ভোজের আয়োজন হলো। চললো অনেক গল্প-গুজব ও হাস্যপরিহাস। শরৎচন্দ্র গান গাইতে পারেন একথা প্রকাশ হয়ে পড়তেই নানাদিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগলো।

লাজুক শরৎচন্দ্র পড়লেন খুবই মুশকিলে। কিন্তু গান না গেয়ে কোন উপায় রইলো না।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখনও চলছে টাপুর টুপুর শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্বভাবসুলভ মধুর কণ্ঠ যেন তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো। সকলেই গান শুনে মুগ্ধ হলেন।

শ্রীমিত্র ছিলেন অতিশয় সংগীতপ্রিয়। সংগীতের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হলো। শরৎচন্দ্রকে তিনি রেঙ্গুনে তাঁর বাড়িতে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। কথায় কথায় জানতে পারলেন শরৎচন্দ্র বেকার। তখন তিনি একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার অফিসে তাঁর একটি অস্থায়ী চাকরি ঠিক করে দিলেন। বেকার জীবনে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র। এবার একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

শরৎচন্দ্র এই চাকরি করেছিলেন প্রায় তিনমাস। এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে রেঙ্গুন যেতেন।

শরৎচন্দ্রের মনে সব সময়েই একটা উদাস ভাব বিরাজ করতো। একদিন রেঙ্গুন যাবার সময় স্টেশনে পাশাপাশি দু'টি ট্রেন দেখে ভুল করে উলটো দিকে যাওয়ার ট্রেনে উঠে পড়েন। তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙলো। তখন আর রেঙ্গুনে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

অনেক রাত্রে আবার তাঁকে পেগুতেই ফিরে আসতে হলো।

সে রাত্রের তুর্ভোগের কথা শুনে অনেকেই তাঁকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। তখন তিনি বলতেন—একটা বইয়ের প্লট তৈরি করতে গিয়েই না এই ফ্যাসাদ ঘটেছে।

সেই সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। হোয়াইট ওয়ে লেড্‌ল কোম্পানির সেলে তিন টাকা পনেরো আনায় তিনি একটি রিস্টওয়াচ কিনেছিলেন। তু'বার মেরামতের পর তৃতীয়বার খারাপ হলে তিনি এক গ্লাস কেরোসিন তেলের মধ্যে সেটা তু'দিন ডুবিয়ে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখা গেল ঘড়িটি ঠিক হয়ে গেছে। তারপর থেকে কারুর ঘড়ির রোগ হলে তিনি সেই ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।

কিছুদিন পর মিঃ চ্যাটার্জী পেগুতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, চলে যান কলকাতায়। তাঁর ওকালতী কাজকর্ম চালাবার জন্য পেগুর উকিল নৃপেন্দ্রকুমার মিত্রকে প্রতিনিধি রেখে যান। শরৎচন্দ্র প্রায় এক বছর নৃপেনবাবুর কাছে ছিলেন।

এই সময় বর্মায় বাঙালীদের উকিল হবার বিশেষ সুযোগ ছিল। যে কেউ কলকাতায় ম্যাট্রিক পাস করে এদেশের ভাষা শিখে ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারতো।

শরৎচন্দ্রও আইনজীবী হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। নৃপেন-বাবু নিজের খরচে তাঁর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করে দিলেন। কিন্তু ব্রহ্মভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না বলে শরৎচন্দ্রের আশা পূর্ণ হলো না।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্রের এক ভাই ধানের ব্যবসা করবার জন্য পেগুতে এলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সহকারিরূপে কিছুদিন কাজ করলেন। তখন তিনি থাকতেন নেওলাধনে কৃষ্ণকুমার মুখার্জীর বাড়িতে। কিন্তু ধানের কাজ শরৎচন্দ্রের মোটেই ভাল লাগলো না, তাই তিনি রেঙ্গুনে ফিরে এলেন।

নয়

১৯০৫ সাল।

বাংলার খ্যাতনামা কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর একমাত্র পুত্র ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্রকে নিয়ে রেঙ্গুন শহরে এসে উপস্থিত হলেন। রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালীরা তাঁকে সংবর্ধনা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

প্রায় সব আয়োজনই ঠিক, এখন প্রয়োজন একজন গান গাইবার লোক। গিরীনবাবুর মুখে শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে কয়েকজন গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন। তখনও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর তা ছাড়া লোকসমাজে মোটেই মিশতেন না। কি যে তাঁর লজ্জা! তিনি কিছুতেই রাজী হতে চাইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে রাজী হলেন। তবে একটি বিশেষ শর্ত রইলো। শর্তটি হলো এই যে, অভ্যর্থনা-সভার এক দিকে পর্দা দিয়ে তাঁর জন্য স্বতন্ত্র স্থান করে দিতে হবে। গান গাইবার সময় কেউ যেন তাঁকে না দেখতে পায়।

'রেঙ্গুন বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব' হলে কবি নবীনচন্দ্রের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর জন্য করা হয়েছে পর্দা দিয়ে ঢাকা আলাদা জায়গা। সেই জায়গায় বসেই শরৎচন্দ্র গাইলেন অভ্যর্থনা সংগীত—

ব্রহ্মভূমি সুশোভিত বঙ্গরতনে আজি হে।
এস কবিবর এস হে, ধন্য কর ব্রহ্মদেশ হে।
সমবেত যত স্বদেশী,
তব দর্শন অভিলাষী
লয়ে পুণ্য প্রতিভারাশি
এস কাব্য-আকাশ-শশী হে।

গান শেষ হওয়ামাত্র শ্রোতাদের মধ্যে এক আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল। সকলের মনেই কৌতূহল জেগে উঠলো—কে এই অন্তরালবর্তী গায়ক! তাঁকে দেখবার জন্য দর্শকদের মনে কৌতূহল জেগে উঠলো। কবি নবীনচন্দ্রও গায়কের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ধন্যবাদ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু পর্দা সরিয়ে দেখা গেল গায়ক নেই। গান শেষ করেই শরৎচন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে কখন চলে গিয়েছেন।

নবীনচন্দ্র গিরীনবাবুকে অনুরোধ করলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেন তাঁকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাঝে মাঝেই নানা লোকের কাছে তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। এর কিছুদিন পর তাঁর পুত্রের জন্মতিথির লগ্ন উপস্থিত হলো। সেই উপলক্ষে কবিবর এক প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে শরৎ-চন্দ্রকেও তিনি নিমন্ত্রণ করলেন।

কিন্তু লাজুক শরৎচন্দ্র সেই ভোজসভায় উপস্থিত হলেন না।

একদিন গিরীন্দ্রনাথ অনেক সাধ্যসাধনা করে শরৎচন্দ্রকে কবিবরের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দোতলায় উঠে সামনের ঘরে উঁকি দিয়েই শরৎচন্দ্র দেখতে পেলেন চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই, রেঙ্গুন হাইকোর্টের জর্জ যতীশরঞ্জন দাশ কবির সঙ্গে গল্প করছেন। তাই দেখে তিনি এমন জোরে দৌড় দিলেন যে তাঁর পায়ের একপাটি জুতো খুলে পড়ে গেল। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হলো ভীষণ। নবীনচন্দ্র মনে করলেন কেউ হয় তো পড়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাস্তার দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন কে একজন একপাটি জুতা পরেই ছুটে পালাচ্ছে। পরে জানতে পারলেন, লোকটি আর কেউ নয়, শরৎচন্দ্র।

সত্যি, কি লাজুক! কিন্তু এ ব্যাপারে বন্ধু গিরীন্দ্রনাথও লজ্জা পেলেন কম নয়।

ফাল্গুন মাস। ১৯০৫ সাল।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব নানা স্থানে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির উদ্যোগেও চলছে সেই উৎসবের আয়োজন।

সেই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রেঙ্গুন শহরে এলেন। রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন বিশিষ্ট বেদান্তিক পণ্ডিত ও ত্যাগী যোগী পুরুষ। ব্রহ্মদেশে তাঁর এই প্রথম পদার্পণ। বৌদ্ধধর্ম প্লাবিত ব্রহ্মদেশে তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের বাণী প্রচার করে যান।

সাধকপুরুষের সৌম্যমূর্তি দেখে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রতিদিন রামকৃষ্ণ মঠে আসতে লাগলেন স্বামীজীর মুখে তত্ত্বকথা শুনবার জন্য। এ ভাবে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো।

যেদিন সাধারণ সভায় বক্তৃতা থাকতো না, সেদিন স্বামীজী তাঁর নির্দিষ্ট বাসকক্ষে সন্ধ্যাকালে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ধর্ম উপদেশ দিতেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক ভক্তের সেখানে সমাগম হতো। শরৎচন্দ্র এলে স্বামীজী তাঁকে রামকৃষ্ণ-সংগীত গাইবার জন্য অনুরোধ করতেন। শরৎচন্দ্র সহজে গান করতে চাইতেন না। অবশেষে গাইতে হতো। অবশ্য বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তিনি গান সংগ্রহ করে দিতেন, নিজেও লিখে দিতেন গান।

রেঙ্গুনে একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। ঐ সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। কবিবর নবীনচন্দ্রও এলেন ঐ সভায়। সেই কথা জানতে পেরে স্বামীজী কবির সঙ্গে আলাপ্ পরিচয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গিরীন্দ্রনাথ স্বামীজীকে নিয়ে একদিন রওনা হলেন কবিবরের বাড়ির দিকে। শরৎচন্দ্রকেও নিয়ে গেলেন। সেদিন শরৎচন্দ্র বিশেষ কোন আপত্তি করলেন না, সংকোচের ভাবও দেখালেন না।

নবীনচন্দ্র সেদিন অবাক্। স্বামীজীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র! এ যে মেঘ

না চাইতেই জল! কবিবর স্বামীজীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ও পদধূলি গ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে করলেন বন্ধুত্বের সম্ভাষণ।

রামকৃষ্ণদেবের জীবন-কথা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। তারপর কবিবর শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনার গান শোনবার আশায় আমি তৃষিত চাতকের মত লালায়িত হয়ে আছি।

শরৎচন্দ্র জানতেন, কবির পুত্র নির্মলচন্দ্রও একজন ভাল গায়ক। তাই বললেন—আজ আমি গান শোনাতে আসি নি, আপনার পুত্র সুকণ্ঠ নির্মলচন্দ্রের গান শুনতে এসেছি।

কবিবর বললেন—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের তুলনা হয় না। স্বামীজী সে কথা শুনে হেসে উঠলেন। বললেন—আজ এখানে একত্রে নবীনচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু আমি শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।

শরৎচন্দ্রের সংকোচ ভাব লক্ষ্য করে কবিবর প্রথমে নির্মলচন্দ্রকে গান করতে আদেশ করলেন। নির্মলচন্দ্র একখানি ব্রহ্মসংগীত গাইলেন। তারপর আর বলতে হলো না, শরৎচন্দ্র অর্গানের সামনে বসে প্রাণের আবেগে গাইতে লাগলেন—

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা, বাকী কিছু নাই।
দাও বাঁচিবার মত কিছু, তার বেশী নাহি চাই।
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি,
(তাই) হাত তুলে শূন্য পানে তোমারে খুঁজি।
···শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে
যেন তোমারি চরণ পাই।

সংগীতের সুরে ও মাধুর্যে যেন এক স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি হলো। স্বামীজী ভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কবি নবীনচন্দ্রও চোখ বুজে সংগীতের রসমাধুর্য আস্বাদন করতে লাগলেন। গান শেষ হলে কবিবর বললেন—আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চির সুন্দরকে মনে করিয়ে দেয়। রেঙ্গুন শহরে এমন রত্ন লুকান ছিল জানতাম না। আমি আজ আপনাকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দিলাম।

গিরীন্দ্রনাথ বহুদিন যাবৎ রেঙ্গুন গভর্নর হাউস ও লিউন্যাটিক এসাই-লামের কণ্ট্রাকটার ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁকে অনেকবার ঐ স্থান দু'টি দেখাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

গিরীন্দ্রনাথ একদিন বললেন—শরৎদা, তুমি কি সত্যি সত্যি লাট-ভবন ও পাগলা-গারদ দেখতে চাও? বেশ, যেদিন লাটসাহেব শহরে থাকবেন না, সেদিন তোমাকে লাটভবনে নিয়ে যাবো। কিন্তু পাগলা-গারদে তোমায় নিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না।

শরৎচন্দ্র তবু যেতে চাইলেন এবং আশায় আশায় দিন গুনতে লাগলেন।

একদিন লাটভবনের বড় মালী সোনাকর গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি এসে উপস্থিত হলো। তার হাতে লাটভবনের বাগানের এক গোছা বাছা বাছা গোলাপ ফুল। ফুলগুলি গিরীনবাবুর হাতে দিয়ে বললো—বাবু, আমার বহুদিনের চাকরির এবার জবাব হবে।

গিরীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেন, তোমার কি অপরাধ?

সোনাকর বললো—কাল আমি বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাং এডিকং সাহেব ঘোড়ায় চড়ে পেছন দিক দিয়ে চলে গেলেন। আমি দেখতে পাই নি, তাই সেলামও করি নি! কিন্তু সেই দোষে তিনি বড় এঞ্জিনিয়ার সাহেবকে আমায় বরখাস্ত করবার জন্য চিঠি দিয়েছেন।

গিরীনবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন, লোকটির পনেরো বছরের চাকরি। সন্তোষজনক ভাবে কাজ করবাব জন্য তার কাছে উচ্চপদস্থ কয়েকজন সাহেবের প্রশংসাপত্র আছে।

গিরীনবাবু বললেন—কাল আমি লাটভবনে যাবো, তখন আমাকে ওগুলি দেখিও।

লাটসাহেব বাইরে আছেন, কাজেই সুবর্ণসুযোগ।

পরদিন গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে লাটপ্রাসাদে গেলেন। লাটপ্রাসাদের কনট্রাকটার হিসাবে তাঁর সর্বত্র অবাধ গতিবিধি ছিল।

সেখানকার কেয়ারটেকার, জমাদার, মালী সকলেই তাঁকে যথেষ্ট খাতির করত।

শরৎচন্দ্র ফটক পার হয়েই মনের উল্লাসে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট উঠোনে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করলেন। ফুলের বাগান, ফোয়ারা, কাঁচের তৈরী ঘরে নানারকম জিনিস দেখতে দেখতে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—এমন সুন্দর রাজভবন, বহুমূল্য আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম আগে কখনও দেখি নি।

বলরুমে ঢুকে মনের আনন্দে বিলাতী ঢংয়ে একটু নাচলেন। যেন ছোট্ট শিশু! ওপরে শয়নকক্ষে ঢুকে নরম কোমল বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে বললেন—এখন তুমিই তো এখানকার লাট হে। দেখ ভাই, কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষী গণনা করে আমাকে বলেছে যে ভবিষ্যৎ জীবনে আমার ধন, মান, যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজদ্বারে আমার খুব সম্মান হবে। আজ তো দেখছি তোমার দৌলতে লাটের বিছানায় শোয়া পর্যন্ত হয়ে গেল।

গিরীনবাবু কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার জ্যোতিষী আর কি বলেছে শরৎদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরও বলেছে, আমার দু'টি বিয়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি প্রজাপতিও আমার গায়ে উড়ে বসলো না।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগলো। খিদেও পেল। নীচে ডাইনিং হলে যেতেই কেয়ারটেকার কফি, বিস্কুট, রুটি ও কলা খেতে দিলেন। এমন সময় সোনাকর মালী তার সার্টিফিকেটগুলি নিয়ে এসে হাজির হলো। তার অবস্থার কথা শুনে শরৎচন্দ্রের মনে খুব দুঃখ হলো। তিনি একটি দরখাস্ত লিখে তার সঙ্গে সার্টিফিকেটগুলি সংযুক্ত করে দিয়ে সোনাকরকে বললেন—এটা লেডি সাহেবের হাতে দিও, তোমার চাকরি যাবে না।

শরৎচন্দ্রের লেখা দরখাস্তে কাজ হয়েছিল। সোনাকরের সত্যি চাকরি যায় নি।

লাটভবন থেকে ফিরবার সময় সোনাকর একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের তোড়া শরৎচন্দ্রকে উপহার দিল। শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—এটা কি ঘুষ নাকি হে?

গিরীনবাবু এবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে চললেন পাগলা-গারদের দিকে। এক বিচিত্র জগৎ এই পাগলা-গারদ। ঢুকতে না ঢুকতেই সেই বিচিত্র জগতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটলো। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বন্ধ দুয়ারে বার বার আঘাত করে ধেই ধেই করে নৃত্য করছে। তা ছাড়াও কত দৃশ্য! কেউ শূন্য হতাশ নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ গলায় ফাঁস জড়িয়ে নিজেই টানাটানি করছে, কেউ মাটিতে শুয়ে জলে সাঁতার কাটার ভঙ্গী করছে।

শরৎচন্দ্র পাগলদের দেখে নিজেও পাগলের মত অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। কেউ ভেংচি কাটলে তিনিও ভেংচি কাটলেন, কেউ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলে তিনিও তেমনি ভাবে হাসলেন।

একজন হৃষ্টপুষ্ট পাগল লোক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ভীষণ চিৎকার করছে দেখে শরৎচন্দ্র কিন্তু গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ ছল ছল করতে লাগলো। উঃ, ভগবান কি নিষ্ঠুর! কি নির্দয়—বলে পাগলের মত হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

অমন ভাবে একজনকে কাঁদতে দেখে দরোয়ান এবং আরও কয়েকজন লোক ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে—লোকটি কি পাগল নাকি? গিরীনবাবু ভয়ানক অপ্রস্তুত হলেন। বললেন—না না, পাগল নয়।

তাড়াতাড়ি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

১৯১০ সাল।

মহামতি গোখলে এলেন রেঙ্গুনে। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হলো।

ভিড়ের মধ্যে যাওয়া শরৎচন্দ্র পছন্দ করতেন না। তাই অভ্যর্থনা সভায় তাঁর টিকিটি দেখা গেল না।

কিন্তু বাঙালী-দরদী গোখলেকে সম্মান না দেখানোর আপসোস শরৎচন্দ্রের মনে কম ছিল না।

রেঙ্গুনে গোখলে এসে উঠেছিলেন শ্রীসেনের বাড়িতে। পরদিন গিরীনবাবুর সঙ্গে সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সামনের একটি ঘরেই গোখলে বসেছিলেন। শরৎচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে গোখলের দিকে এগিয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বললেন—I have come to see and pay my respect to you.

গোখলে নমস্কার গ্রহণ করে কি যেন জবাব দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—বাব্বা! ওসব লোকের সঙ্গে কি কথা বলা যায়?

দশ

শরৎচন্দ্র থাকতেন রেঙ্গুন শহর থেকে প্রায় তু'মাইল দূরে লোয়ার গোজনডং অঞ্চলে। ছোট একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় শরৎচন্দ্র ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সামনেই ছিল একটি মাঠ, কিছুদূরে ইরাবতী নদী।

পাড়াটার নাম ছিল মিস্ত্রীপাড়া। দরিদ্র পল্লী। শরৎচন্দ্র হয়ে উঠলেন সেই পল্লীর আপনজন। কেউ তাঁকে বলতো বামুন দাদা, কেউ বলতো দাদাঠাকুর। কারুর অসুখ করলে বিনা পয়সায় তিনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন।

শরৎচন্দ্রের একটি ডাক্তারী ব্যাগ ছিল—তাতে অনেকরকম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ থাকতো। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর ভালই জ্ঞান ছিল। কোন রোগী এলে তিনি ব্যাগ খুলে ওষুধ দিতেন। দূরে কারুর অসুখের খবর পেলে সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে চলে যেতেন। শুধু ওষুধ নয়—জায়গা বিশেষ পথ্যও দিতেন। অনেক সময় রাত জেগেও করতেন রোগীর শুশ্রূষা।

পাড়ার লোকের চিঠিপত্র, দরখাস্ত লেখা, তাদের সকল কাজে পরামর্শ দেওয়া এবং ঝগড়া বিবাদ মিটানো ছিল দরিদ্রের বন্ধু শরৎচন্দ্রের কাজ।

বাড়ির নীচে থাকতেন লোহালক্কড়ের কারখানার এক মিস্ত্রী। বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী। দরিদ্র অথচ মাতাল। কয়েকবছর আগে স্ত্রী মারা গিয়াছে। একটি মাত্র মেয়ে—নাম শান্তি। স্বভাব-চরিত্র শান্ত নম্র। মাতাল পিতার অনেক উৎপীড়ন তাকে সহ্য

করতে হয়। মুখ বুজে নীরবে সব সহ্য করে, অথচ গৃহকর্মের কোন ত্রুটি করে না।

মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে অথচ চক্রবর্তী বিয়ে দিতে পারছে না। কি করে দিবে? যা উপার্জ্জন করে, তার বেশির ভাগ টাকা নেশার পেছনেই উড়ে যায়। মাতাল চক্রবর্তীর আর এক বন্ধু আছে বৃদ্ধ ঘোষাল। সেও মাতাল। দরকার হলে তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে চক্রবর্তী টাকা ধার করে। কিন্তু ধার আর শোধ করতে পারে না। এমনি ভাবে অনেক টাকা বৃদ্ধ ঘোষালের পাওনা হয়ে গেল। এবার টাকা শোধ করে দেবার জন্য চাপ দিতে লাগল চক্রবর্তীর ওপর।

চক্রবর্তী দেনা শোধ করবার কোন উপায় দেখতে পায় না। অগত্যা মেয়েকেই বৃদ্ধ ঘোষালের কাছে বিয়ে দিতে রাজী হয়।

সে কথা জানতে পেরে শান্তি শিউরে ওঠে। নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শরৎচন্দ্রকে সব কথা জানায়।

সব কথা শুনে শরৎচন্দ্রের মন ব্যথায় ভরে উঠলো। তিনি শান্তিকে আশ্বাস দিলেন—দেখি আমি কি করতে পারি।

শান্তির বিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সক্ষম হলেন না। বর পাওয়া দায় হয়ে উঠলো। কারণ এই বিয়েতে প্রাপ্তিযোগ তো ছিলই না উপরন্তু ঘোষালের দেনা বরকে শোধ করতে হবে।

অবশেষে শরৎচন্দ্র নিজেই ঘোষালের দেনা শোধ করলেন। বিনা পণে শান্তিকে নিজে বিয়ে করলেন।

কিন্তু বিয়ে নিয়েও ঝামেলা হলো অনেক। সেই ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য শরৎচন্দ্র সেই পল্লীর বাসা ছেড়ে অন্য পল্লীতে গিয়ে উঠলেন।

বিয়ের খবর কিন্তু শরৎচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ জানলো না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোকের

সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। কারণ তিনি লোকের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন না।

সুখেই কাটতে লাগলো শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবন। কিছুকাল পরে তাঁদের একটি ছেলে হলো। প্রায় দু'বছর একটানা সুখের জীবন তাঁরা কাটিয়ে চললেন।

কিন্তু সুখের জীবনে হঠাৎ দুঃখের সুর বেজে উঠলো।

সেই সময়ে রেঙ্গুনে দেখা দিল দুরন্ত প্লেগ রোগ। প্লেগ রাক্ষসীর আক্রমণে দলে দলে লোক মরতে লাগলো। তখন এই রোগের কোন ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই কোনরূপ চিকিৎসা করার আগেই রোগী মারা যেত।

প্লেগ রোগে হঠাৎ ছেলেটি একদিন মারা গেল। শরৎচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই শোকে কাতর হয়ে পড়লেন।

চারদিকে তখন প্লেগের আতঙ্ক।

এই মহামারীর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যাগযজ্ঞ ও পূজার দ্বারা দৈবকে সন্তুষ্ট করার জন্য রেঙ্গুনে দুর্গাবাড়িতে এক শনিবার রক্ষাকালী পূজার আয়োজন হলো।

শরৎচন্দ্র তখন পুত্রশোকে কাতর। পূজার কথা শুনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাবাড়িতে পূজা দিতে গেলেন।

অনেকদিন পর বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলো। শরৎচন্দ্রের পুত্রবিয়োগের কথা তিনি জানতেন না। সব কথা শুনে গিরীন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেন। কথায় কথায় শরৎচন্দ্র বললেন—যে পল্লীতে থাকি সেখানে আবার প্লেগ দেখা দিয়েছে। দরিদ্র পল্লীর দিকেই মহামারীর টান বেশী।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—তুমিও শহরের দিকে পালিয়ে এসো শরৎ-দা। কি সুখে ঐ নোংরা পল্লীতে আছো?

শরৎচন্দ্র বললেন—কি করবো ভাই, সামান্য মাইনে পাই, বেশী টাকা বাড়ি ভাড়া দেবো কি করে?

'প্রফুল্ল-কাননে' রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের সম্ভ্রান্ত দে-সরকার পরিবারের সুযোগ্য সন্তান স্বর্গীয় হিতাবন্ধু অনিলকুমার দে মহাশয়ের উদ্যানবাড়ী 'প্রফুল্ল-কানন'-এ (বর্তমানে এই বাড়ীটি বেলেঘাটা সংক্রামক হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত) ১৩৪০ সালে ছবিটি নেওয়া হয়। দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত 'উদয়ন' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদক শ্রীঅনিল দে মহাশয় কর্তৃক আয়োজিত এই ঘরোয়া মজলিস অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উপস্থিত হয়েছিলেন অনিলবাবুর একান্ত আগ্রহে। ব্যক্তিগতভাবে অনিল বাবুকে স্নেহ করতেন বলে একান্ত দুর্লভ দুই সাহিত্য মহারথীর এক আসরে উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল। কবিগুরু 'উদয়ন' পত্রিকার নামকরণ কবিতা লিখে এবং শরৎচন্দ্র ছোট গল্প দিয়ে 'উদয়ন' পত্রিকাকে বিশিষ্টতার শীর্ষে তুলে ধরেন। এছাড়া মনীষী জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, রায়বাহাদুর জলধর সেন, অনুরূপা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকার রচনায় পত্রিকাটি সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কর্মজীবনে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র সাহিত্য-চর্চা ও মাতৃভাষার সেবা করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য বন্ধু 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন ও পরে এই মহৎ কাজের পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বছর দুই চলার পর অনিলবাবুর আকস্মিক শারীরিক অসুস্থতার দরুন পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

পূজো দিয়ে শরৎচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন

প্লেগ রোগের প্রকোপ মোটেই কমলো না। মানুষের মনে ভয়ের ভাব ক্রমেই বাড়তে লাগলো। যে পল্লীতে প্লেগ রোগ দেখা দেয় সে পাড়ার লোক ভয়ে পালাতে থাকে। কারুর রোগ হলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাবও হারিয়ে ফেলতে লাগলো।

সেই পাড়ার একটি বউয়ের সঙ্গে শান্তিদেবীর আলাপ ছিল। সময়ে সময়ে সেই বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করতেন। একদিন সেই বউটির প্লেগ হলো। শুশ্রূষা করার কেউ নেই। শান্তিদেবী গোপনে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। অথচ শরৎচন্দ্রের কাছে কিছু বললেন না।

কিন্তু অচিরেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শান্তিদেবী নিজেই প্লেগ রোগের কবলে পড়লেন। শরৎচন্দ্র দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। পাড়াপ্রতিবেশী কেউ এগিয়ে এলো না। অবশেষে ছুটতে ছুটতে গেলেন গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—ভাই গিরীন আমার বড় বিপদ, স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে।

গিরীন্দ্রনাথ শুনে শিউরে উঠলেন। বললেন—কি সর্বনাশ! বল কি শরৎদা? কে দেখছে?

শরৎচন্দ্র বললেন—এখনো ডাক্তার ডাকতে পারি নি। মাস শেষ, হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই।

গিরীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই, আমি অপূর্ব ডাক্তার অথবা ডাঃ দেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি চলে যাও, রোগিণীর কাছে গিয়ে বসো।

শরৎচন্দ্র চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর গিরীন্দ্রনাথ একজন ডাক্তার নিয়ে উপস্থিত হলেন। রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোশের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে অচৈতন্য অবস্থায় ছটফট করছেন।

শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন অতি কষ্টে। এক বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁর শিয়রে বসে পাখার বাতাস করছে।

ছোট্ট ঘর। ঘরে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর মোটা মোটা কয়েকখানি বই, একখানি ক্যাম্বিজের ইজি-চেয়ার, একটি গড়গড়া, একটি রেঙ্গুনপ্যাটার্ন কাঠের সিন্দুক, কাঠের আলনায় কায়কখানি কাপড়। সামান্য জিনিসপত্রে ঘরটি সাজানো। দেয়ালে কয়েকখানি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের মাঝখানে একখানি রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ছবি।

রোগিণীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বুঝলেন, অবস্থা শোচনীয়। শরৎচন্দ্র স্ত্রীর বিছানার পাশে উদ্বিগ্ন মনে বসেছিলেন। ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন—ডাক্তারবাবু, ওকে বাঁচান। আমার যে আর কেউ নেই।

ডাক্তার বাবু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। গিরীনবাবুও বললেন—এখন আসি শরৎদা, পরে আবার আসবো।

শরৎচন্দ্র হতভম্বের মত বিছানার পাশে বসেই রইলেন। দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। রোগিণীর জ্ঞান ছিল না। এমন সময় হঠাৎ একটু জ্ঞান ফিরে এলো। ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি দেবী বললেন—দেখ, তোমার অনেক অবাধ্য হয়েছি—আমায় ক্ষমা করো।

শরৎচন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন—শান্তি, তুমি অমন করে কথা বললে যে বড় ভয় পাই।

শান্তি দেবী বললেন—ছিঃ, ভয় কিসের! আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও, আশীর্বাদ কর।

কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র বুঝলেন, কিছুতেই আর মানুষটিকে ধরে রাখা যাবে না। সত্যি তাই হলো। শান্তি দেবী সংসারের দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করে পরলোকে চলে গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যু-মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন।

মৃতদেহ সংকারের কোন লোক পাওয়া গেল না। প্লেগের আতঙ্কে সবাই ভীত। তা ছাড়া যে পল্লীতে শরৎচন্দ্র থাকতেন, সাধারণ ভদ্র সমাজের সঙ্গে সেই পল্লীর কোন যোগাযোগ ছিল না। অথচ রাত্রের মধ্যেই শবদাহ না করলেও মুশকিল। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে নানা কৈফিয়ত তলব করবে, নানারকম ঝামেলা হবে।

শরৎচন্দ্র আবার গিয়ে হাজির হলেন গিরীন্দ্রনাথের বাড়িতে। গিরীন্দ্রনাথও বুঝতে পারলেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। এখন শব সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে কোন লোকই যোগাড় করতে পারলেন না। অনেকে নানারকম প্রশ্ন তুললো—শরৎবাবু আবার বিয়ে করলেন কবে? কোথায় কার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হতো, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকতো, তা হলে আজ ভাবতে হতো না। অন্ততঃ বিশ পঁচিশজন বন্ধুবান্ধব তোমার স্ত্রীর সবদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেতো। কিন্তু তুমি কখনও তাদের সঙ্গে মেশ নি, তোমার বিবাহিত জীবনের কথাও অনেকে জানে না।

শরৎচন্দ্রের মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়লো। তিনি হতাশ ভাবে বললেন—তা হলে কি হবে?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—চলো দেখি, যাই।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে পল্লীর দিকে চললেন। তখন অনেক রাত, পথে কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। আকাশে চাঁদ উঠেছে, মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা। পথ চলতে চলতে তাঁরা শুনতে পেলেন, দূরের কুলীবস্তি থেকে ভেসে আসা বুকভাঙা কান্নার চাপা শব্দ।

বারান্দার এক পাশে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর 'ভেলু' সামনের পা দু'টি মেলে মাথাগুঁজে শুয়ে আছে। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলছে জ্বল জ্বল করে।

ভেলু শরৎচন্দ্রকে দেখে অস্বাভাবিক স্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। এ যেন তার করুণ কান্না! শরৎচন্দ্র অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করলেন।

এত রাত্রে আর কোথায় লোক পাওয়া যাবে? গিরীন্দ্রনাথ একখানি কুরঙ্গী—মানুষ-টানা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে নিয়ে এলেন। দু'জনে অতিকষ্টে ধরাধরি করে তাতে শবদেহ তুললেন। দু'জন কুলী ঠেলে ঠেলে গাড়িটা নিয়ে চললো শ্মশানের দিকে। শরৎচন্দ্র আর গিরীন্দ্রনাথ হেঁটে হেঁটে চললেন।

জনমানবহীন শ্মশান। রাত্রিবেলায় তা যেন আরও নির্জন আরও ভয়াবহ। হঠাৎ কে যেন মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে উঠলো—

আমি শুধুই রইনু বাকী,
যা ছিল তা চলে গেল, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে
আমার কিছুই রাখলি নি রে,
আমি শুধু আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণে মা বেঁচে থাকি!

গান শুনে দু'জনেই চমকে উঠলেন। এত রাত্রে কে এই শ্মশানে? কিছুক্ষণ পরেই গিরীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, শ্মশানবাসী উদাসী বাবাজীর কণ্ঠস্বর। এই জনমানবহীন শ্মশানে মাঝে মাঝে একটি ভাব-পাগল সন্ন্যাসী এসে বাস করতো। সবাই তাকে ডাকতো উদাসী বাবাজী বলে।

তাঁর গান শুনে শরৎচন্দ্র কেঁদে গিরীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন। গিরীনবাবু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কেঁদে আর কি হবে শরৎদা, মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করো।

দু'জন মাত্র লোকে শব দাহ করা কি সহজ ব্যাপার? তবু উপায় কি! করতেই হলো। উদাসী বাবাজীও কিছু কিছু সাহায্য করলো।

চিতার আগুন নিভে গেলে পর উদাসী বাবাজীই নদী থেকে

কলসী ভরে জল এনে চিতায় ঢালতে লাগলো। আর গাইতে লাগলো—

খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখান
চারদিকে সব খেলার মেলা, খেলা শুধু আনাগোনা।
খেলতে খেলা ভবের হাটে, কোত্থেকে সব মানুষ জোটে,
খানিক খেলে খেলনা ফেলে কোথায় পালায় যায় না জানা।

শরৎচন্দ্রকে শোকে অধীর দেখে উদাসী বাবাজী বললো—বাবা! বিরাটের চিন্তা কর, সান্ত্বনা পাবে।···এ সংসারটা একটা দোলনা। মা আমাদের দোল দিচ্ছেন নিয়ত—জন্ম ও মৃত্যু—এপাশ আর ওপাশ। দেখলে তো, উলঙ্গ এসেছিল, উলঙ্গ চলে গেল ; একা এসেছিল, একাই গেল। আসবার সময় যে দেহটি সঙ্গে এনেছিল সেটিও গেল না। অগ্নিসংযোগে কেবল ধীরে ধীরে পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেল। যদি ধর্মকর্ম কিছু সঞ্চিত থাকে, তাই আত্মার সহগামী হয়েছে।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ শান্তশিষ্টের মত উদাসী বাবাজীর পাশে চুপ করে বসে রইলেন। তখন আকাশে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে প্রভাতের আলো। উদাসী বাবাজী অনেকটা আনমনেই শরৎচন্দ্রের ডান হাতখানি তুলে নিল। তার একটু করকোষ্ঠী বিচারের জ্ঞান ছিল। শরৎচন্দ্রের হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে সে বললো—বাবা, আবার তোমায় সংসার করতে হবে।

শরৎচন্দ্রের মন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলো। গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, এবার বাড়ি চলো।

শ্মশান ছেড়ে দু'জনেই লোকালয়ের দিকে চললেন।

শরৎচন্দ্রের সম্বল ছিল অল্প, কিন্তু মন ছিল উদার। কারুর দুঃখ দেখলে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিতেন। ভেবে দেখতেন না, এরপর নিজের অবস্থা কি হবে।

একবার এক বন্ধুর টাকার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। কোথাও টাকা যোগাড় করতে না পেরে শরৎচন্দ্রকে এসে ধরলো। শরৎচন্দ্র

নিজে জামিন হয়ে এক চেটীর কাছ থেকে টাকা ধার করে দিলেন। হ্যাণ্ডনোটে দুই বন্ধুরই সই রইলো।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বন্ধুটি হলো পলাতক। তখন পাঁচশো টাকার ঋণ শরৎচন্দ্রের ঘাড়ে এসে পড়লো। চেটী জানিয়ে দিল, নালিশ করে সে টাকা আদায় করবে। সে কথা শুনে শরৎচন্দ্র খুবই ভীত হয়ে পড়লেন।

এই চেটী সম্প্রদায় বড় ভয়ংকর লোক। তারা দাক্ষিণাত্যের মাদুরা ও রামেশ্বর অঞ্চলের লোক। ভগবান তাদের প্রচুর অর্থ দিয়েছেন কিন্তু ভাগ্যে সুখ দেন নি। সুদের অঙ্ক কষেই তাদের আনন্দ। সুখভোগ থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করে। অদ্ভুত এক অভিশপ্ত জাত।

শরৎচন্দ্র এদের পাল্লায় পড়ে বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। প্রবাসে শরৎচন্দ্রের সম্পদ ও বিপদের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানলেন, শরৎচন্দ্রের মহাজন চেটীটির নাম আনা-মুনা-কানা পালিয়ানাপ্পা চেটী। নামের বহর দেখে তাঁর মনে হলো এই চেটী গুজরাটী ধনকুবের ডাঃ পি. জে. মেটার কাছ থেকে টাকা এনে সুদের কারবার করে। ডাঃ মেটা একজন ব্যারিস্টার ও ডাক্তার। কিন্তু ব্যবসা করেন। তিনি মাহাত্মা গান্ধীর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মহাত্মাজীর অনুপ্রেরণায় ইনি স্বরাজ ফাণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। অন্যান্য সৎকাজেও দান করেছেন প্রায় লাখ খানেক টাকা।

ডাঃ মেটার সঙ্গে গিরীনবাবুর হৃদ্যতা আছে। তাই শরৎচন্দ্রকে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। ডাঃ মেটা ছিলেন সংগীতানুরাগী। গিরীনবাবু তা জানতেন। তাই শরৎচন্দ্রকে বললেন গান গাইতে। শরৎচন্দ্র আপত্তি করলেন না। সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন হিন্দী গান—

ভক্তি হরিকো নেহি কিয়া তো কেয়া কিয়া কুছভি নেহি,
নাম প্রভু কো নেহি লিয়া তো কেয়া কিয়া কুছভি নেহি।
শিখ্‌কর বিদ্যা বহুত সে বাদশাওঁ সে মিলা,
শ্যামসুন্দর সে মিলা নেহি তো মিলা কুছভি নেহি।

ডাঃ মেটার বাড়ির মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা ছিল না। তাই সকলেই সেই সংগীত-সভায় এসে উপস্থিত হলেন। গান শুনে সবাই আনন্দিত, সবাই মুগ্ধ। হিন্দী গানের পর বাংলা গানও শরৎচন্দ্রকে গাইতে হলো।

ফিরবার সময় গিরীনবাবু শরৎচন্দ্রের বিপদের কথা ডাঃ মেটাকে বললেন। মেটা প্রতিশ্রুতি দিলেন—চেটীর সঙ্গে একটা মীমাংসা করে দেবেন।

এ ব্যাপারে অবশ্য একটু দেরি হয়ে গেল। কারণ পরদিন মহাত্মা গান্ধী রেঙ্গুনে এলেন। কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর অভ্যর্থনা করার উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে মহাত্মাজীকে ডাঃ মেটার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেদিন অপরাহ্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে গিরীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ডাঃ মেটার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অন্য সময় হলে শরৎচন্দ্র হয় তো ঐ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিতেন না, কিন্তু আজ তিনি নিজের গরজে এসে এক পাশে বসে রইলেন। সন্ধ্যার একটু আগে উপাসনা আরম্ভ হলো। শরৎচন্দ্রকে একটি ভজন গান গাইতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি গাইতে সংকোচ বোধ করলেন।

উপাসনা শেষ হওয়ার পর সান্ধ্য ভোজের ডাক পড়লো। ডাঃ মেটা ও মহাত্মাজী পাশাপাশি বসলেন। তাঁদের দু'দিকে অন্যান্য সবাই সারি সারি বসলেন। শরৎচন্দ্র রইলেন বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের পাশে। ডাঃ মেটার স্ত্রী নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। তাঁদের দেশাচার বা যে কোন কারণেই হোক তিনি প্রথমে সকলের থালায় বাঁ হাতে তুলে দু'খানি করে রুটি দিলেন। ঐ রুটির ওপর পড়লো এক হাতা গরম ঘি, ভাজি, পকোড়া, তরকারি, মেওয়া ও জাফরান মিশ্রিত দুধ-পাক।

মেটার স্ত্রী বাঁ হাতে রুটি দিলেন বলে শরৎচন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। রুটি ছুঁলেন না। গান্ধীজী দুধ ও ফল খেতে খেতে গল্প

করছিলেন, সকলেই তাঁর কথা শুনতে ব্যস্ত ছিল, শরৎচন্দ্রের দিকে কেউ লক্ষ্য করেন নি।

পরে আসতে আসতে গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—শরৎদা, তুমি খেলে না কেন?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—ভাই, একে স্ত্রীলোক, তার ওপর বাঁ হাতে দেওয়ায় রুটি খেতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি হল না। শুধু দু'বাটি দুধ-পাক চেয়ে খেলাম। জিনিসটা বেশ হে।

মহাত্মা গান্ধী গোখলেকে খুব সম্মান করেন সে কথা শুনে শরৎচন্দ্র খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন—গান্ধীজীর নামটা বেশ সুন্দর হে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। কিন্তু চেহারাটি মোটেই সুবিধার নয়।

গান্ধীজী চলে যাবার পর একদিন ডাঃ মেটা সেই চেটী ও শরৎচন্দ্রকে নিজের অফিসে ডাকিয়ে গোলমালটা মিটিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র ২৫০ টাকা দিয়ে ৫০০ টাকার দায় থেকে রেহাই পেলেন। সেই টাকাটা অবশ্য শরৎচন্দ্রকে তখনই দিতে হলো না। তাঁর সংগীত-মুগ্ধ রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখার্জী তাঁকে ধার দিয়ে বললেন—শরৎদা, তোমার যখন সুবিধা হবে এই টাকা শোধ দিও।

এগারো

শরৎচন্দ্র গল্প লিখতেন। তাঁর সাধনা ছিল নীরব। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও জানতে পারতেন না যে তিনি গল্প লেখেন। লাজুক প্রকৃতির শরৎচন্দ্র সব ব্যাপারেই ছিলেন লাজুক। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন, সে কথাও অনেকেই বহুদিন জানতে পারে নি। তার উপর ছবি আঁকায় তাঁর ভাল হাত ছিল। পিতার কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন সাহিত্যিক প্রেরণা, তেমনি পেয়েছিলেন চিত্রাঙ্কনের ঝোঁক।

শরৎচন্দ্রের আঁকা প্রথম ছবিটির নাম ছিল 'রানী মন্দোদরী', দ্বিতীয় চিত্র 'মহাশ্বেতা'। এই মহাশ্বেতা ছবিটি আঁকেন যখন তিনি রেঙ্গুন শহর থেকে দু'মাইল দূরে লোয়ার পোজনডং অঞ্চলে মিস্ত্রী-পাড়ার ছোট একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় থাকতেন। সামনে ছিল বড় মাঠ—তারপর ইরাবতী নদী।

'মহাশ্বেতা' ছবির প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছ থেকে। বর্ষাকালে ঝাপসা নদীতীর···দূরে মেঘময় আকাশ···তারই ফাঁকে উঁকি দিয়েছে সূর্য। নদীর তীরে গাছের নীচে সদ্যস্নাতা এলোকেশী তপস্বিনী মহাশ্বেতা···বর্ষার প্রকৃতির যেন একখানা মনোরম জীবন্ত চিত্র।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক পরিবর্তন

হয়েছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। বাসাও নিয়েছিলেন শহরে একটি ভাল অঞ্চলে।

শ্মশানের উদাসী বাবাজী তাঁকে বলেছিল—আবার তোমায় সংসার করতে হবে। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীও বিফল হয় নি।

দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম হিরণ্ময়ী দেবী। তাঁর পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী ছিলেন মেদিনীপুর জেলার শ্যামচাঁদপুরের অধিবাসী। চাকরির জন্য পাটনায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। স্ত্রী মারা যায়। একমাত্র কন্যা বালিকা হিরণ্ময়ীকে নিয়ে চলে আসেন রেঙ্গুনে। এখানেও তাঁর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে।

ভাগ্যচক্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদাস অধিকারীর পরিচয় হয়। নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, তার উপর কন্যাদায়। শরৎচন্দ্র তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য কৃতসংকল্প হন। রেঙ্গুনে বিনা অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র মাল্যদানে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। হিরণ্ময়ীর বয়স তখন চৌদ্দ-পনর বছর।

হিরণ্ময়ী দেবীর কোন ছেলেমেয়ে হয় নি। সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কোন লোকজন ছিল না। একটি কুকুর ও কয়েকটি পাখির বাচ্চা নিয়ে ছিল তাঁদের সংসার। সন্তানের মতই শরৎচন্দ্র কুকুর ও পাখিদের ভালবাসতেন।

যে রাস্তায় শরৎচন্দ্র বাস করতেন তার নামটি ছিল বেশ, বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীট। এবারও থাকতেন কাঠের দোতলা বাড়িতে।

বেশ সুখেই দিন কাটছিল। ছিল না কোন ঝঞ্ঝাট—কোন অশান্তি।

হঠাৎ একদিন বিপদ ঘটলো।

পাশেই ছিল ধোপার ঘর। একদিন রাত্রে সেই ঘরে কেমন করে আগুন লেগে গেল। ধোপা তার জিনিসপত্র সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু ঘরে তার ছাগল ছানাটি পরিত্রাহি চিৎকার করছে, সেদিকে ধোপার খেয়াল নেই। আর খেয়াল করলেও ছাগল-ছানার চাইতে জিনিসপত্রের দাম তার কাছে বেশী। কিন্তু সেই

অবোধ পশুর করুণ চিৎকার শরৎচন্দ্রের মনের ভেতর গিয়ে আঘাত করলো। তিনি ছুটে গেলেন খোপার ঘরের মধ্যে। কোলে করে ছাগলছানাটিকে নিয়ে আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে আসতে না আসতেই দেখলেন, আগুন তাঁর নিজের ঘরেও প্রবেশ করেছে। ছাগল ছানাটিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী তখন ঘরের জিনিসপত্র নীচে নামিয়ে আনছেন। কিছু কিছু জিনিসপত্র আবার ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন নীচে। কিন্তু তাতেও এত সময় লাগছে যে ঘরের সব জিনিস রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

তবু ঘরের কোন দামী জিনিসপত্রের দিকে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি নেই। তিনি এক হাতে কুকুর 'ভেলু' আর পাখি 'বাটু বাবা'কে নিয়ে অন্য হাতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। এমন সময় মনে পড়লো ঘরের মধ্যে তাঁর দামী দামী বই রয়েছে আর রয়েছে লেখার পাণ্ডুলিপি। কিন্তু সেগুলো সরাবার আর সময় পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল অনেকগুলো বই, 'নারীর ইতিহাস' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আর তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি 'মহাশ্বেতা'।

•

রেঙ্গুনের গতানুগতিক জীবনে এলো এক আলোড়ন। খবর এলো —বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপান হয়ে আমেরিকা যাবার পথে রেঙ্গুনে আসবেন। রেঙ্গুনের বাঙ্গালীদের মন আনন্দে ও উৎসাহে মেতে উঠলো। শুরু হয়ে গেল কবিগুরুকে অভ্যর্থনা করার নানা আয়োজন ও জল্পনা-কল্পনা।

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. সি. সেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আতিথ্যগ্রহণ করবেন। কাজেই শ্রীসেনই হয়ে উঠলেন অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা। গিরীন্দ্রনাথকে তিনি বললেন— ভাল বাংলা লিখতে পারে এমন কোন লোককে দিয়ে একটি অভিনন্দন-পত্র লেখাও।

গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। শ্রীসেন বললেন—তাঁর নাম তো কখনও শুনি নি। যা হোক্, লেখাটা যেন ভাল হয়।

গিরীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎচন্দ্র অভিনন্দনপত্র লিখে দিলেন। অভিনন্দন পত্রখানি শ্রীসেনের এবং অনেকেরই খুব ভাল লাগলো। স্থির হলো সেটিই অভ্যর্থনা সভার পড়া হবে।

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে এসে পৌঁছলেন। জাহাজঘাটায় তাঁকে দেখবার জন্য মানুষের কি ভিড়! তাঁকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা শ্রীসেনের বাড়িতে এসে পৌঁছলো।

পরদিন নগরবাসীর পক্ষ থেকে হলো জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভার আয়োজন। সেই সভায় বহু ইংরেজ, বাঙালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, চীনা, জাপানী, বর্মিজ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। অভ্যর্থনা-হলে তিল ধারণের জায়গা রইলো না।

কথা ছিল শরৎচন্দ্র উদ্বোধন-সংগীত গাইবেন। কিন্তু অভ্যর্থনার বহর দেখে এবং প্রচুর লোকসমাগমের খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সভাতেই গেলেন না। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র ডাঃ পি. দাস সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়ে সভার মান রক্ষা করলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের লেখা অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করলেন—

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি-লিট্

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুর, নব রাগিণীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু-পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে এই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে —কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি? আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্য-বীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরে চরণে প্রার্থনা।

রেঙ্গুন, ভবদীয় গুণমুগ্ধ

২৫শে বৈশাখ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ

রবীন্দ্রনাথ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে বললেন—আমার কবিখ্যাতি সমস্ত বাংলা দেশ পরিব্যপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যতদিন না ইওরোপের সাহিত্য-রসিক সমাজের বিচারে আমি অগ্রগণ্য-কবি বিবেচিত হয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ না করলাম, ততদিন আমার দেশ আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নি।

পরদিন চোরের মত চুপি চুপি শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, জুবিলী হলে তোমার গুরুদেবকে দেখবার জন্য শহরসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল, শুধু তুমি অনুপস্থিত, এই কি তোমার গুরুভক্তি?

শরৎচন্দ্র বললেন—ভাই, তুমি তো জান যে সভাসমিতির হাওয়া আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। নির্জনে খানিকক্ষণ বসে রবিবাবুর কথাবার্তা শুনতে ভারী ইচ্ছা হয়। তোমার তো মিঃ সেনের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি আছে, চল না তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে আসি।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—বেশ, নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তুমি রবিবাবুর কাছে যেতে পারবে তো? না, গোখলের সঙ্গে দেখা করবার মত ঘরে ঢুকেই দৌড় দেবে?

শরৎচন্দ্র বললেন—না, এবার ঠিক পারবো।

গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে নিয়ে শ্রীসেনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। ড্রয়িং রুমে মিঃ এনড্রুজ, মিঃ পিয়ারসন প্রভৃতি অনেকে ছিলেন, কিন্তু রবিবাবু ছিলেন না। এত অপরিচিত বিশিষ্ট লোকদের দেখে শরৎচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। গিরীন্দ্রনাথ প্রায় টানতে টানতেই তাঁকে শ্রীসেনের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—ইনিই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা অভিনন্দন পত্রখানির লেখক।

শ্রীসেন শরৎচন্দ্রকে বসতে অনুরোধ করলেন। শরৎচন্দ্র নিতান্ত সংকোচের সঙ্গেই একখানি চেয়ারে বসে পড়লেন। গিরীন্দ্রনাথ তাঁকে

সেখানে বসিয়ে রেখে রবিবাবুর সন্ধানে দোতলায় চললেন। সিঁড়িতে দেখা হলো শ্রীসেনের পুত্রবধূ সুজাতা দেবীর সঙ্গে। সুজাতা দেবী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ কন্যা।

রবীন্দ্রনাথ দোতলার হল ঘরে একাই পায়চারি করছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ যেতেই তাঁকে বসতে বললেন এবং রেঙ্গুনের বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এমন সময় সুজাতা দেবী এসে খবর দিলেন, একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফার গিরীনবাবুকে খোঁজাখুঁজি করছেন।

গিরীন্দ্রনাথ রবিবাবুকে বললেন—নীচে আপনার সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটো তোলবার ব্যবস্থা করছি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার আবার ফটো তোলা কেন?

সুজাতা দেবী বললেন—গিরীনবাবু যখন এসেছেন তখন ছাড়বেন না। আপনাকে যেতেই হবে।

রবিবাবু বললেন—সুজাতা যখন বলছে তখন ফটো না তুলে উপায় কি।

বেশ পরিবর্তন করবার জন্য তিনি একটি ছোট ঘরে ঢুকে পড়লেন। সুজাতা দেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গিরীন্দ্রনাথ নীচে এসে দেখেন শরৎচন্দ্র সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, রবিবাবু আসছেন, এক্ষুণি গ্রুপ ফটো তোলা হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে তোমাদের জন্য। আমার মত চড়াই পাখির রবিবাবুর সঙ্গে বসে ফটো তোলা সাজে না।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন দেখেই শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি হন হন করে ফটক পার হয়ে গেলেন। পাগল কি সাধে বলে!

১৯১৬ সাল।

শরৎচন্দ্র কিছুদিন থেকেই ভাবতে লাগলেন—বর্মাদেশে আর

তিনি থাকবেন না। নানাদিক থেকে নানা বাধা আসছে। মনের গতি দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সব চেয়ে মুশকিল হলো ডান পা-টাকে নিয়ে। বাতে প্রায় পঙ্গু হবার মত অবস্থা। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়া খুবই দরকার। ওদিকে কার্যস্থলেও নানারকম ঝামেলা লেগেই আছে। তার ফলে লেখাও এগোচ্ছে না।

চাকরি জীবন শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের ধাতে সইলো না। একাউনট্যান্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সঙ্গে সামান্য কারণে একদিন কথা কাটাকাটি শুরু হলো—তারপর হলো ঘুষাঘুষি।

এই ঘটনায় বন্ধুবান্ধব সকলেই মনে করলো, এটা শরৎচন্দ্রের খুবই বাড়াবাড়ি। এর ফলে অনেক দুঃখ তাঁকে সইতে হবে। সরকারী চাকরি কোনদিন আর তাঁর অদৃষ্টে জুটবে না। এ ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে অফিসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলাই ভালো।

কিন্তু শরৎচন্দ্র কারুর পরামর্শ শুনলেন না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। স্থির করলেন কলকাতা চলে যাবেন।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরের রেঙ্গুন বাস তাঁর শেষ হলো। রেঙ্গুন ছেড়ে আসার আগের দিন গিরীন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ সরকার এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু বেঙ্গলী সোস্যাল ক্লাব হলে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। সকলের চোখই ছিল অশ্রু ছলছল।

শরৎচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী
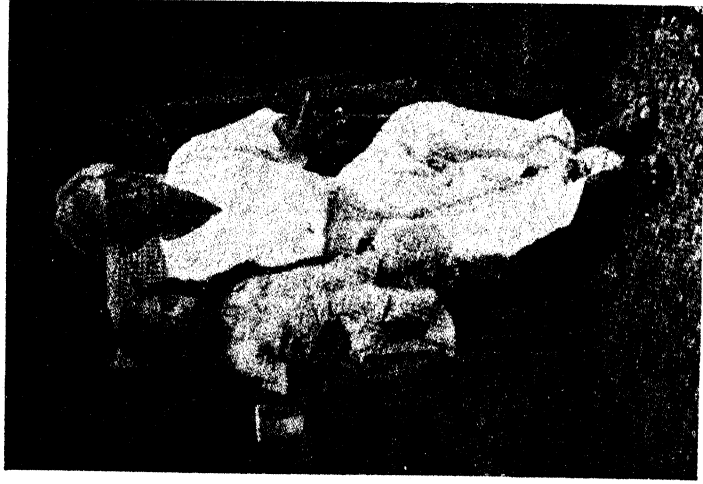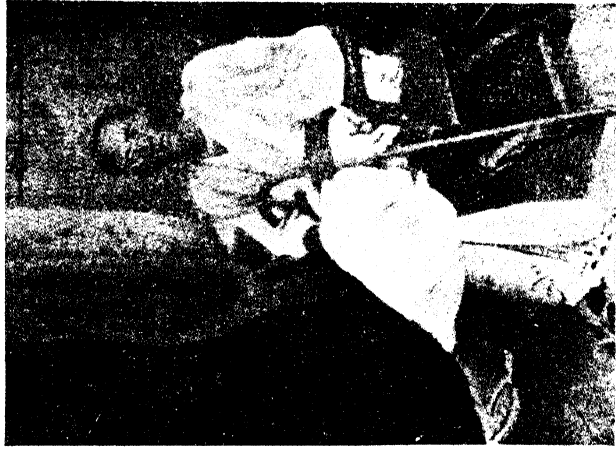
যৌবনে শরৎচন্দ্র

বারো

শরৎচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করতেন অতি নীরবে। তিনি হইচই পছন্দ করতেন না। বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই তাঁর সাহিত্য-চর্চার খবর ভালভাবে জানতো না।

তবে খবর রাখতেন তাঁর সুরেন মামা। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রেঙ্গুনে চাকরি করার সময় শরৎচন্দ্র ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। সুরেন মামার কাছে দিয়ে আসতেন তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি। বলে দিয়ে আসতেন, যদি 'প্রবাসী'তে এগুলো ছাপার ব্যবস্থা করতে পারো তবেই ছাপাতে দেবে।

একদিন ডাকে 'ভারতী' পত্রিকা এলো শরৎচন্দ্রের নামে।

শরৎচন্দ্র খুলে দেখলেন তাতে 'বড়দিদি' লেখাটি ছাপা হয়েছে। এটা প্রথম কিস্তি—ধারাবাহিক ভাবে লেখাটি বের হবে। কিন্তু লেখকের কোন নাম নেই।

এটা অনেক বছর আগেকার লেখা। সুরেন মামার কাছে লেখাটা গচ্ছিত ছিল। নিশ্চয়ই তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছেন। কিন্তু নাম নেই কেন?

শরৎচন্দ্র চিঠি লিখলেন সুরেন মামার কাছে। যথাসময়ে তার জবাব এলো। তিনি লিখেছেন, লেখাটা প্রবাসীতেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'প্রবাসী' ছাপলো না। লেখাটা সরলা দেবীর খুব ভাল লাগে। তিনি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে লেখাটি 'ভারতী'তে ছাপার ব্যবস্থা

করেন। দু'সংখ্যায় পর পর লেখাটি বেরোতেই পাঠকমহলে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল। কে এই অসাধারণ লেখক? অনেকেরই মনে ধারণা হলো এ লেখা রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। কিন্তু তৃতীয় সংখ্যাতেই লেখক হিসাবে এক অপরিচিত লোকের নাম ছাপা হলো—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাংলার পাঠকসমাজ সেই আশ্চর্য নূতন লেখককে সাদরে বরণ করে নিল।

লেখার বিষয়ে নিজের লজ্জা ও দুর্বলতা শরৎচন্দ্রের অনেকটা কেটে গেল। তিনি লেখেন আর পড়িয়ে শোনান সাহিত্যিক বন্ধু যোগেন সরকারকে। 'নারীর ইতিহাস' আর 'চরিত্রহীন' দুটো লেখা একই সঙ্গে চলেছে। যোগেনবাবু শুনতে শুনতে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়েন। বলেন—সত্যি খুব চমৎকার হচ্ছে শরৎদা।

চমৎকার হবে না কেন? শরৎচন্দ্রের জীবনে যে অনেক অভিজ্ঞতা আর মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দরদ। লেখবার সময় তাঁর মনে হয় যেন চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—জানো যোগীন, বানানো গল্প লিখতে আমার মন ওঠে না। জীবনে যা দেখেছি, যা দেখে থাকি—আমি তাই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চাই। কল্পনা নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু সে কল্পনা বলতে বোঝাবে বাস্তবের অন্তর্দৃষ্টি। তার জোরেই আমরা চরিত্রগুলোকে দরকার মতো নতুন করে গড়ে পিটে নিতে পারি।

বাঙলার পাঠকদের কাছে শরৎচন্দ্র ক্রমশঃ পরিচিত হতে থাকলেও রেঙ্গুনে তখনও তিনি অপরিচিত।

১৯১২ সাল।

শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলে শরৎচন্দ্র অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। হাওড়ার খুরুট রোড়ে একটা দোতলা বাড়িতে তার সাময়িক আস্তানা।

মেঝের ওপর বিছানা পাতা। বইপত্রগুলো ছড়ানো। এক পাশে নানা রঙের কালি আর আট দশটা ফাউন্টেন পেন। সব সময়ে একই কালিতে আর একই কলমে লিখতে তাঁর ভাল লাগে না। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্র লিখছিলেন। ডাক শুনে মুখ তুলে দেখেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অবাক্ হয়ে বললেন—আরে উপীন যে, তুমি এখানে কেমন করে ?

উপেন্দ্রনাথ এক পাশে বসে পড়ে বললেন—কেমন করে আবার! বেলুড় মঠে গিয়ে প্রভাসের কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা নিয়ে অতি কষ্টে এসে খুঁজে বের করেছি তোমাকে।

শরৎচন্দ্রের সংসারত্যাগী মেজো ভাই প্রভাস। তখনো তিনি স্বামী বেদানন্দ হন নি, প্রভাস ব্রহ্মচারী নামেই পরিচিত আছেন। উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন—কি লিখছো ?

—চরিত্রহীন।

—চরিত্রহীন ? সেটা কি পদার্থ ?

—উপন্যাস। চার-পাঁচশো পাতা আগে লিখেছিলাম। সেটা আগুন লেগে পুড়ে গেছে। তাই আবার লিখছি।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—লেখাটা দাও তো, একটু দেখি।

মাত্র পাঁচ ছ'টা পরিচ্ছেদ তখন লেখা হয়েছে। লেখাটা উপেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ পড়া শুরু করে আর মুখ তুলতে পারলেন না। শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি কি এখনই পড়ে ফেলতে চাও নাকি ? কিন্তু সময় যে অনেক লাগবে।

অগত্যা ঠিক হলো, উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যাবেন। পড়ে ফেরত দিয়ে যাবেন দু'দিন বাদে।

উপেন্দ্রনাথ বাড়িতে গিয়ে 'চরিত্রহীন' পড়ে ভয়ানক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেটা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির কাছে। সুরেশবাবু রচনার ভঙ্গী ও ভাষায় মুগ্ধ হলেন খুব। কিন্তু বিষয়বস্তু তাঁর কাছে ভাল লাগলো না।

উপেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই 'যমুনা' পত্রিকার অফিস। ফণীন্দ্রনাথ .পাল তার সম্পাদক। উপেনবাবু ফণীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কথাটি পাড়লেন। ফণীন্দ্রনাথ বললেন—আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন যাতে শরৎবাবুর লেখা নিয়মিতভাবে যমুনায় পাওয়া যায়।

উপেন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন 'যমুনা' অফিসে। ফণীবাবু ভয়ানক খুশী। তাঁর আদর অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র যমুনায় লেখা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

তার তিন চার দিন পরেই শরৎচন্দ্র বর্মায় ফিরে যাবার কথা। ফণীবাবু এক সেট 'যমুনা' তাঁকে উপহার দিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর কথা রেখেছিলেন। রেঙ্গুন থেকে অনেকগুলি লেখাই পর পর পাঠিয়ে দিলেন 'যমুনা'র জন্য। রামের সুমতি, চন্দ্রনাথ, পথনির্দেশ এবং আরও অনেক লেখা যমুনায় ছাপা হলো। 'চরিত্রহীন'-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদও বের হলো যমুনায়। তবে কিছু লেখা ফণীবাবু পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। শরৎচন্দ্রের কৈশোর বয়সের অনেক লেখাই তাঁদের কাছে গচ্ছিত ছিল।

তবে একথাও সত্য, শরৎচন্দ্রের বিনা অনুমতিতেই কিছু কিছু লেখা 'যমুনা' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু লেখা ছদ্মনামেও ছাপা হতো। 'নারীর মূল্য' 'কানকাটা' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল 'অনিলা দেবী'র নামে।

সেই সময়ে কলকাতায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা বের করার তোড়জোড় চলছিল। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারী। উদ্যোক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তিনি হলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে হরিদাস বাবুর কলেজের বন্ধু। প্রমথনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের হৃদ্যতা ছিল। তাই হরিদাসবাবু প্রমথবাবুর ওপর দিলেন ভারতবর্ষের জন্য শরৎচন্দ্রের লেখা আদায়ের ভার।

শরৎচন্দ্র তখন 'চরিত্রহীন' লিখছেন। লেখা শেষ হতে না হতেই তিনদিক থেকে তিনটি পত্রিকা তাঁর উপন্যাসটি নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো। ফণীবাবু চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছেন। এদিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতিরও মনোভাব পালটে গেছে। তিনিও উপন্যাসটির জন্য শরৎচন্দ্রকে তাগিদ দিতে লাগলেন। ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'চরিত্রহীন' ছাপাবার জন্য বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে প্রার্থী হলেন প্রমথনাথ।

এদিকে শরৎচন্দ্রের লেখার যেমন প্রশংসা, তেমনি আবার নিন্দাও ছড়াচ্ছে। কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ আসছে—শরৎবাবু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দুর্নীতি প্রচার করছেন। তাই শরৎচন্দ্র কিছুটা অভিমানের সঙ্গেই প্রমথনাথকে লিখলেন—'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। আমার 'চরিত্রহীন' তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে।

আরও লিখলেন—একটা অহংকার করবো—মাপ করবে ?···আমার চেয়ে ভালো নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প উপন্যাসের জন্য অনুরোধ করো।

শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে'র কিছুটা অংশ প্রমথবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে 'যমুনা'য় বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল 'চরিত্রহীন' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

কিছুদিন পরেই শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে তাগিদ দিয়ে পত্র দিলেন চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠাবার জন্য।

ওদিকে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের তোড়জোড় পুরোদমে চলছে। সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করলেন। তখন রায় বাহাদুর জলধর সেনের ওপর সেই ভার পড়লো।

১৩২০ সালের কার্তিক মাসের 'যমুনা'য় চরিত্রহীনের প্রথম কিস্তি ছাপা হলো। শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' এই সময়ে ফণীবাবুই প্রকাশ করেন।

এদিকে প্রমথবাবুর ঘন ঘন তাগিদে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের জন্য 'বিরাজ বৌ'-এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন।

১৩২০ সালের পৌষ মাসে ভারতবর্ষে 'বিরাজ বৌ'-এর প্রথম কিস্তি ছাপা হলো। তার কয়েক মাস পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো 'বিরাজ বৌ'। এটি তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ।

ওদিকে ফণীবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যমুনার প্রচার-সংখ্যা বাড়াবার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যমুনার সম্পাদন-কার্যে যোগদান করবেন। ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় অন্যতম সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হলো।

কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এলেন। কিছুদিন যাবৎ সেখানে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। বাতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার ওপর আমাশয়, জ্বর। বায়ু পরিবর্তন এবং লেখার ব্যাপারে কতগুলি জরুরী কাজের জন্য তাঁকে কলকাতায় আসতে হলো।

সঙ্গে এলেন স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। প্রিয় কুকুর ভেলুকেও সঙ্গে আনতে ভুললেন না। কলকাতায় চোরবাগানের এক ভাড়া-বাড়িতে এসে উঠলেন।

খবর পেয়ে বন্ধু-বান্ধবরা এসে দেখা দিতে লাগলেন। রোজ সন্ধ্যায় জমে উঠতে লাগলো সাহিত্যের মজলিস। পুরনোরা ছাড়াও নূতনদের মধ্যে আসতে লাগলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়।

হঠাৎ অফিস থেকে জরুরী তার পেয়ে শরৎচন্দ্রকে একাই রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হলো। হিরণ্ময়ী দেবী রইলেন আর রইলো ভেলু। কারুর

সঙ্গে যাওয়ার সুবিধা হলেই হিরণ্ময়ী দেবী চলে যাবেন। প্রমথবাবুই তাঁর দেখা শোনার এবং তাঁকে রেঙ্গুন পাঠাবার ভার নিলেন।

যমুনায় 'চরিত্রহীন' তখনও প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু কোন কারণে ফণীবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভুল বোঝাবুঝি হলো। ফলে 'যমুনার' সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তিনি ত্যাগ করলেন।

এরপর থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক ভাবে বের হতে লাগলো 'পল্লীসমাজ'। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষ পত্রিকার আশ্চর্য এক যোগসূত্র স্থাপিত হলো। প্রবাসীতে যেমন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে তেমনি শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র অপরিচিত হলেও কলকাতায় তিনি পরিচিত। কলকাতার মানুষ তাঁকে চায়—চায় কলকাতার পত্রিকাওয়ালারাও। দূর থেকে তাঁর লেখার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক মত রাখা যাচ্ছে না।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিকের তরফ থেকে হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন—লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসুন। আপনার লেখা ও গ্রন্থাবলী বাবদ মাসে একশো টাকা করে দেবো।

লম্বা ছুটি নয়—একেবারে ছুটি। অঘটন ঘটে গেল অফিসে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই শরৎচন্দ্র কলকাতায় চলে আসবেন স্থির করলেন।

পথখরচ ও অন্যান্য খরচ বাবদ হরিদাসবাবুর কাছ থেকে পাওয়া গেল অগ্রিম তিনশো টাকা।

ইংরেজী ১৯১৬ সাল।

বন্ধুরা দিলেন বিদায় সংবর্ধনা।

বিদায় রেঙ্গুন—বিদায় বর্মা।

তেরো

হাওড়ার বাজেশিবপুর। ৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেন।

রেঙ্গুন থেকে এসে এখানেই বাসা নিলেন শরৎচন্দ্র। চলতে লাগলো একনিষ্ঠ ভাবে সাহিত্য-সাধনা।

ভারতবর্ষে নিয়মিত ভাবে তাঁর লেখা বেরুচ্ছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, দেবদাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। তারপর একে একে নিষ্কৃতি, চরিত্রহীন, কাশীনাথ, স্বামী, দত্তা এবং শ্রীকান্ত ২য় পর্বও প্রকাশিত হলো।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বাজার তখন জমজমাট।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটতে লাগলো। তাঁর কাছে যাতায়াত করতে লাগলো নবীন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সম্পাদকরা।

শুধু নিজের বাড়িতে নয়, 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার অফিসে বসতো সাহিত্য মজলিস। শরৎচন্দ্র তাঁর দেশবিদেশে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। গল্প বলার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। সেই মজলিসে এসে বসতেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমল হোম, দিলীপকুমার রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রও আসতেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন সকলের মধ্যমণি।

ছ'মাস ছিলেন নীলকমল কুণ্ডু লেনে। তারপর চার নম্বর বাজেশিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে বাসা নিলেন। একখানা একতলা কোঠাবাড়ি। ছোট্ট উঠোন। উঠোনের একধারে একটি ফুলের বাগান এবং একটি পেয়ারা গাছ।

সংসারে কোন ঝামেলা নেই। স্বামী আর স্ত্রী। প্রভুভক্ত কুকুর 'ভেলু' আর প্রিয় টিয়া পাখি 'বাটুবাবা' তো আছেই। তবে ইদানীং একটি ভৃত্য রেখেছেন, নাম ভোলা।

ছোট্ট সংসারে এসে হাজির হলেন ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র। মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী, বেদানন্দ নামে পরিচিত। তিনি মাঝে মাঝে আসেন। পানিত্রাস থেকে বড়দিদি অনিলা দেবীও আসেন মাঝে মাঝে।

সংসার একটু বড় হলো। প্রকাশচন্দ্র বিয়ে করলেন মুঙ্গেরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা কনকলতাকে।

শরৎচন্দ্রের খ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের আয়ও বেড়েছে। সাহিত্য থেকে তখন তাঁর মাসিক আয় প্রায় পাঁচশো টাকা।

সাহিত্যের উপাদান খুঁজতে ও আবহাওয়া বদল করতে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে কাছাকাছি পল্লীগ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। বড়দি অনিলাদেবীর বাড়িও গ্রামে—পানিত্রাসে গোবিন্দপুরে। শরৎচন্দ্র দিদির অনুরোধে মাঝে মাঝে সেখানেও যেতেন—দু'একদিন থাকতেন।

গোবিন্দপুরের চারপাশের গাঁয়ের মানুষ বড় গরিব। কেউ থাকে জীর্ণ কুটিরে, অনেকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, কারুর নেই লজ্জানিবারণের বস্ত্র। ঐ সব মানুষদের দুঃখ দেখে শরৎচন্দ্রের মনে বড় ব্যথা লাগতো। তিনি মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় ও টাকাপয়সা নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাস পুস্তকাকারে বের হবার আগে ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। শেষ অংশটি ছাপার জন্য

এলে ভারতবর্ষের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও শরৎচন্দ্রের বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের খুব মনঃপূত হলো না। তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—দাদা, যে ভাবে বিয়োগান্ত করে এই বই শেষ করেছেন, ঐ ভাবে না করে এই ভাবে শেষ করলে কেমন হয় বলুন তো?

এই বলে তিনি একটি নির্দেশ দিলেন।

হরিদাসবাবুর নির্দেশটি কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভালোই লাগলো। তিনি সেই ভাবেই অংশটি বদলে দিলেন। পরে বইও ঐ ভাবে ছাপা হলো। বই প্রকাশ করলো হরিদাসবাবুদের প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স।

অরক্ষণীয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে এক মজার ঘটনা ঘটলো।

একদিন মফস্বলের এক ক্লাব থেকে হরিদাসবাবুর কাছে অদ্ভুত একটি চিঠি এলো। ক্লাবের এক সভ্য লিখেছে—অরক্ষণীয়ার উপসংহার নিয়ে আমাদের ক্লাবে সেদিন তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। এমন কি বাজি রাখা হয়েছে পর্যন্ত। আমাদের মধ্যে একদলের মত—জ্ঞানদাকে শ্মশান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর অতুল তাকে বিয়ে করবে, শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। অপর দল বলছে—না, তা কখনই নয়। কাজেই এই ব্যাপারে এখনও কোন মীমাংসা হয় নি। আপনি দয়া করে শরৎবাবুর কাছ থেকে তাঁর নিজের অভিমত যদি জেনে দেন তো বড় ভাল হয়।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে এই চিঠির কথা শোনালে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আপনার কথা শুনেই তো এই বিপদ হলো। বেশ তো আমি জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে দিয়েছিলাম। তাতে অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচতো, আর লেখক এবং প্রকাশকও বাঁচতো। এখন কি জবাব দিই বলুন তো? এ ভাবে আরো চিঠি এলেই তো গেছি আর কি!

হরিদাসবাবু সে কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

শরৎবাবু একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা ওরা তো জানতে চেয়েছে,

জ্ঞানদা আর অতুল শ্মশান থেকে যাবার পর কি হলো ? ঠিক আছে। আপনি লিখে দিন, শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছেন তারপর অতুল কি জ্ঞানদা কারো সঙ্গেই আর শরৎবাবুর দেখা হয় নি। সুতরাং তাদের কি হলো তিনি আর বলতে পারেন না।

সে কথা শুনে হরিদাসবাবুর হাসি আর থামতেই চায় না।

আরও একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল এরও কিছুকাল আগে। 'যমুনায়' শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থেকে লেখা পাঠাতেন। একদিন কলকাতায় এসে 'যমুনা' কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। ফণীবাবু অফিসে ছিলেন না। ছিলেন সহকারী সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি লেখা-নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছিল তাঁর নেড়ী কুকুরের বাচ্চা। রোগা দেহ, মাথায় উস্কো-খুস্কো চুল, পরনে আধময়লা ধুতি ও পায়ে সাধারণ চটিজুতো দেখে হেমেন্দ্রকুমার ভাবলেন, লোকটা দপ্তরী না হয়ে যায় না।

সাহিত্যিক ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বসবার জন্য টেবিলের এধারে ওধারে কয়েকখানা চেয়ার ছিল। দপ্তরী বা ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য ঘরের কোণে ছিল একখানা বেঞ্চি। হেমেন্দ্রকুমার ঐদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে শরৎচন্দ্রকে বসতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর ঢুকলেন ফণীবাবু। হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন—একি শরৎবাবু যে! রেঙ্গুন থেকে কবে এলেন? ওখানে বেঞ্চির ওপর বসে কেন?

শরৎচন্দ্র হেমেন্দ্রকুমারকে দেখিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন—কি করবো বলুন, উনি যে এখানেই আমাকে বসতে বললেন।

হেমেন্দ্রকুমার অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বললেন—ক্ষমা করবেন, আমি তো ওঁকে কখনো দেখিনি।

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, তারপর চেয়ারে এসে বসে কুকুরের বাচ্চাটাকে স্থাপন করলেন টেবিলের উপরে।

চৌদ্দ

শিবপুরে থাকতেই শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসেন।

রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘনঘটা। স্বদেশপ্রেমিকদের মনে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার। ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা স্বদেশী আন্দোলনে।

সারা বাঙালায় তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জনপ্রিয় নেতা। তাঁর ত্যাগে ও স্বদেশপ্রেমে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ।

দেশবন্ধুর তখন একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল—'নারায়ণ'। শরৎচন্দ্রকে তিনি তাঁর পত্রিকায় লেখা পাঠাবার জন্য আহ্বান করলেন। শরৎচন্দ্র সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। লেখা পাঠালেন। লেখাটি দেশবন্ধুর খুব ভাল লাগলো—কিন্তু গল্পের নামটা ভালো লাগলো না। তিনি নিজেই তখন লেখাটির নামকরণ করলেন—'স্বামী'।

দেশবন্ধুর অনুরোধেই শরৎচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'শিক্ষার বিরোধ' 'মহাত্মাজী' এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখলেন।

লেখার জন্য সব লেখককেই চিত্তরঞ্জন পারিশ্রমিক দিতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে কত দেওয়া যায় স্থির করতে না পেরে তিনি টাকার ঘর খালি রেখে একটি চেক পাঠিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্র সেই চেকে লিখে নিলেন একশো টাকা।

কোন এক বন্ধু সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—মাত্র একশো টাকা লিখলেন শরৎদা? ওতে স্বচ্ছন্দে ছ' পাঁচ হাজার টাকা বসিয়ে নিতে পারতেন। তাতে দাশ সাহেবের টাকার এতটুকু টান পড়তো না।

সে কথা শুনে শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন—তা হয়তো পড়তো না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে এসে চিত্ত কলঙ্কিত করতে পারবো না ভাই।

দেশবন্ধুর আহ্বানেই শরৎচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পরাধীন ভারতবাসীর ওপর ঝুলছে তখন ইংরেজ শাসকের নিষ্ঠুর খড়্গ। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার ওপর চললো গুলিবর্ষণ। বিক্ষোভের ঝড় বইতে লাগলো সারা দেশ জুড়ে।

মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন।

বাংলার বিপ্লবী দল রক্তের বদলে রক্ত নেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কলকাতায় ইংরেজ সৈন্যের বন্দুক ও মেসিন গানকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো আবালবৃদ্ধ বনিতার মিছিল। শরৎচন্দ্রও কলম ছেড়ে সেই মিছিলে এসে দাঁড়ালেন। হাওড়ায় এক শোভাযাত্রার পুরোভাগে তাঁকে দেখা গেল।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপ্লবের ঝড়।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ছুড়ে ফেলে দিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

শরৎচন্দ্র ভাবতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন সরকারী খেতাব গ্রহণ করেন তখন নাকি দেশবন্ধু কেঁদেছিলেন। আজ নিশ্চয়ই সেই খবর শুনে তিনি খুশী হবেন।

দেশবন্ধু কাছে থাকলে শরৎচন্দ্র তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু তিনি তখন কারাগারে। শুধু দেশবন্ধু নন, মহাত্মাজী, সুভাষচন্দ্র এবং আরও অনেক নেতা তখন বন্দী।

উন্মত্ত ঝড়ের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে গেল ১৯২০ সাল।

১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। গল্প-উপন্যাস লেখার চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগানো লেখার দিকেই এবার তিনি ঝুঁকে পড়লেন বেশী। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' এবং 'তরুণের বিদ্রোহ' তাঁর এই সময়েই সৃষ্টি।

১৯২২ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন দেওয়া হলো। অভিনন্দন পত্রটি লিখলেন শরৎচন্দ্র—

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু—

হে বন্ধু, তোমার দেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নরনারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশ্যে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনিই

গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু আর একদিন এই বাংলা দেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্ব পণে তোমাকে পথের বাহির হইতে হইল, সেদিন, তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল—'নান্য-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

এই তো তোমার ব্যথা। এই তো তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে পার না—তাই, বাংলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল

না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ তাইতো আজ তোমার করতলে। তাই তো, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাটী, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানব-জীবনের দেনা পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতির সর্বদেশে সর্বকালে,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনোমতে কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অলক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘবাণী স্বদেশে, বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙালী তুমি; তাই তো সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছে,—আর

আমাদের শরৎচন্দ্র—

'ষোড়শী' রচনাকালে শরৎচন্দ্র
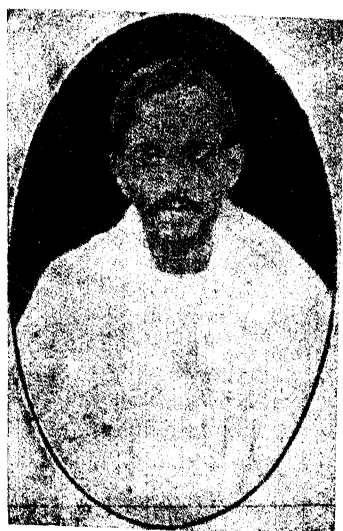
আনিয়াছে বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ,—তুমি
চিরজীবী হও ! তুমি জয়যুক্ত হও !

তোমার গুণমুগ্ধ—স্বদেশবাসীগণ।

একদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের। পাঁচ বছর পরে দেখা।

শরৎচন্দ্র তখন সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। গিরীন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, শরৎচন্দ্র হয়তো তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথাই বলবেন না।

কিন্তু মুহূর্তেই তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু ও বাসন্তীদেবীর সঙ্গে কোন এক জরুরী আলোচনা করছিলেন। কথা শেষ করেই ছুটে এসে গিরীনবাবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কি ভাই গিরীন, তুমি কবে এলে ?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—প্রায় তিন বছর।

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি একেবারে রেঙ্গুন ছেড়ে এলে ? রেঙ্গুন যে অন্ধকার হয়ে গেল।

গিরীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—ত্রিশ বছর হয়ে গেল, আর ভাল লাগে না শরৎদা, তাই চলে এসেছি।

—এতদিন এসেছ জানলে আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। এখানে তোমার বাড়ি কোথায় ?

—খিদিরপুর। তুমি তো শিবপুর থাক। দেশবন্ধুর বাড়িতে কি মনে করে ?

শেষে জানা গেল দু'জনেই একই উদ্দেশ্যে এসেছেন। গিরীন্দ্রনাথ খিদিরপুর কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি ও বি. পি. সি-র সদস্য বলে মাঝে মাঝে তাঁকে এখানে আসতে হয়। আর শরৎচন্দ্রকেও দেশবন্ধু হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি করেছেন। কাউন্সিলে প্রবেশের ব্যাপার নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যদের তুমুল মতবিরোধ চলছে, তাই এসেছেন পরামর্শ করতে।

কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বললেন—শুনেছ বোধ হয় আমি কলকাতা এসেই রায় সাহেবের ঋণের টাকাটি শোধ করে দিয়েছি।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ শুনেছি।

১৯২২ সাল।

গয়াতে বসবে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। দেশবন্ধু তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

যথাসময়ে দেশবন্ধু গয়াতে গেলেন। শরৎচন্দ্রকেও সঙ্গে যেতে হলো। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন শরৎচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন।

সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু বললেন—অসহযোগকারীদের আইন সভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। কারণ তবেই তাঁরা ভিতর থেকে সরকারের প্রত্যেক অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারবেন।

রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় দেশবন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। দেশবন্ধু তখন কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্যদল' নামে একটি আলাদা দল গঠন করলেন।

কংগ্রেসের বৃহত্তম দল দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর পক্ষে। ইংরেজী বাংলা সমস্ত সংবাদপত্রগুলিই দেশবন্ধুকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করতে লাগলো। দেশবন্ধুর এই অবস্থা দেখে তাঁর অন্যতম সমর্থক ও সহকর্মী শরৎচন্দ্র একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সংসারের কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাতে পারে না?

দেশবন্ধু জবাব দিলেন—তা হলে আর কি রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মধ্যে অহর্নিশি জ্বলছে, এক মুহূর্তেই আমাকে তা ভস্মসাৎ করে দিত।

এই সময়ে দেশবন্ধুর দলে একরূপ লোকই নেই, অর্থ নেই, হাতে একখানা কাগজও নেই। বিরুদ্ধ দল গালিগালাজ না করে কোন

কথা বলে না। দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকেন।

অর্থ সংগ্রহের জন্য বড়লোকদের কাছে মাঝে মাঝে ধরনা না দিয়ে উপায় থাকতো না। একাজে সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গী হতেন।

একদিন রাত তখন নয়টা কি দশটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে শিয়ালদহ অঞ্চলে এক বড়-লোকের বাড়িতে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য গেলেন। দেশবন্ধু এক সময় এই বড়লোকটিকে জেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ বসে থেকেও গৃহকর্তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। শরৎচন্দ্র অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন —চলুন ফিরে যাই। গরজ কি একা আপনার? দেশের লোক যদি হাত মুঠো করে থাকে, আপনার কি ভূতে ধরেছে দেশোদ্ধার করার?

দেশবন্ধু মৃদু হেসে বললেন—এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরা কাজ করতে জানি নে। আমরাই তাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারি নে। বাঙালী ভাবুকের জাত। বাঙালী কৃপণ না। একদিন যখন সে বুঝবে, তার সবস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।

শরৎচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

দেশবন্ধু একদিন কলকাতার এক সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে-ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্র। সভা থেকে ফেরবার পথে গাড়ির মধ্যে দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আমাকে অনেকে আবার প্র্যাকটিস্ করে দেশের জন্য টাকা রোজগার করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। আপনি কি বলেন?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের

জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক্! এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়।

ঘুরতে ঘুরতে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ছে। তাঁর অনুগামীরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিন শরৎচন্দ্র গেলেন দেশবন্ধুর বাড়িতে। কথায় কথায় বললেন—ত্যাগ ও দুঃখ বরণ ছাড়া যখন স্বরাজ লাভ হবেই না আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং দুঃখেরও যখন চরম হয়েছে, তখন এইবার একখানা পা কেটে ফেলুন। তার ফলে আপনার যে ত্যাগ ও দুঃখ তাতে স্বরাজ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।

দেশবন্ধু এই কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শরৎচন্দ্র পকেট থেকে বের করলেন চেক বই। মোটা টাকার একখানা চেক দেশবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন।

কৃতজ্ঞতায় দেশবন্ধুর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না

স্বরাজ্যদলের কাজ মোটামুটি ভালই চলতে লাগলো। 'ফরোয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবন্ধু তাঁর নির্ভীক মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

এর কিছুদিন পর বরিশালে রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করা হলো।

দেশবন্ধু ষ্টীমারে বরিশাল চলেছেন। সঙ্গী শরৎচন্দ্র। আলো নিভিয়ে দু'জনে কেবিনে শুয়েছেন। জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে অন্ধকার আকাশের বুকে মিটি মিটি তারা।

কিছুক্ষণ পর দু'জনেই ডেকে গিয়ে বসলেন। কথায় কথায় দেশবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি চরকায় বিশ্বাস করেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আপনি যে বিশ্বাসের কথা বলতে চাইছেন, সে বিশ্বাস আমার নেই?

—কেন নেই?

—বোধ হয় অনেকদিন চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু বললেন—ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে যদি পাঁচ কোটি লোকও সুতো কাটে তা হলে ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তা পারে। দশ লক্ষ লোক এক সঙ্গে হাত লাগালে একদিনেই একটা বাড়ি তোলা যেতে পারে। কিন্তু মানুষগুলোকে এক করতে হবে। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের সসম্মানে কোলে টেনে নিন, মেয়েদের ওপর অন্যায়, নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটান—তা হলে আর লোকের অভাব হবে না।

দেশবন্ধু আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—আপনারা দয়া করে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকবো। আমি ঢের কাজ করতে পারবো। বেচারাদের ধোপা নাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না। অথচ এরাই মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। এরকম অর্বাচীন সমাজ মরবে না তো মরবে কে?

দেশবন্ধু এবং শরৎচন্দ্র দু'জনেই ছিলেন মানব প্রেমিক---দরিদ্র দরদী। দেশবন্ধু নিজের জীবনের মূল্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন আর শরৎচন্দ্র প্রমাণ করেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বুকের রক্ত দিয়ে।

কংগ্রেসের নির্দেশ ছিল চরকা কাটা ও খদ্দর পরা!

শরৎচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে চরকা কাটলেও এবং খদ্দর পরলেও কংগ্রেসের এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। চরকা কাটলে যে স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েও চরকায় যে অবিশ্বাসী, একথা মহাত্মা গান্ধীও জানতেন।

গান্ধীজী একবার কলকাতায় এসে তখনকার অন্যতম জাতীয়তাবাদী

দৈনিক 'সার্ভেণ্টের' কার্যালয় দেখতে যান। কলকাতায় তিনি দেশবন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন। দেশবন্ধুর বাড়ি থেকে সার্ভেণ্ট অফিসে যাওয়ার সময় অনেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে গেলেন। শরৎচন্দ্রও গেলেন।

সার্ভেণ্ট কার্যালয়ে গিয়ে মহাত্মাজীর ইচ্ছা হলো সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে চরকা কাটবেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলো চরকা আনা হলো।

সকলেই মহাত্মাজীর সঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন। শর চন্দ্রের সুতো খুব মিহি হলো। গান্ধাজী তা দেখে বললেন—ইউ স্পিন বেটার দ্যান মেনি লাভারস অব চরকা।

শরৎচন্দ্র বললেন—আই হ্যাভ লার্ন্ট স্পিনিং বিকজ আই হ্যাভ লাভ ফর ইউ।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বভাব সুলভ হাসি হেসে বললেন—বাট হোয়াই ডোণ্ট ইউ বিলিভ দ্যাট্ দি অ্যাটেনম্যাণ্ট অব স্বরাজ উইল বি হেলপড বাই স্পিনিং।

উত্তরে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—নো, আই ডোণ্ট বিলিভ। আই থিংক অ্যাটেনম্যাণ্ট অব স্বরাজ ক্যান ওর্নলি বি হেল্পড বাই সোলজারস এণ্ড নট্ বাই স্পাইডারস।

কথা শুনে মহাত্মাজী হাসতে লাগলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই বহু কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করছিলেন। শরৎচন্দ্র একটানা বহু বছর হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকলেও একবারও তিনি জেলে যান নি।

কংগ্রেস কর্মীরা আইন অমান্য ঘোষণা করে তখন দলে দলে জেলে যাচ্ছেন। সেই সময়ে সুভাষচন্দ্র একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎবাবু, আপনাকে একবার জেলে যেতেই হবে।

সেকথা শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—আরে সুভাষ, আমারও তো খুবই ইচ্ছে। আর জেলে যেতে সব সময়েই প্রস্তুত আছি। কিন্তু

মুশকিল হয়েছে কি জানো—সেখানে যে আফিং দেবে না। আফিং ছাড়া যে আমি বাঁচবো না।

সুভাষচন্দ্র বললেন—সে আমি যোগাড় করে দেবার ব্যবস্থা করবো। সেজন্য আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—তুমি যে আমার সঙ্গে সব সময়েই জেলে থাকবে তার কি মানে আছে? না, ওতে সুবিধা হবে না হে। দেখ দেখি! আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধু ঐ আফিং এর জন্যই জেলে যাওয়া হচ্ছে না। একি কম দুঃখ!

দেশবন্ধুকেও শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন—শুনি জেলে গেলে নাকি আফিং দেয় না, তামাকও দেয় না। তাই আমার জেলে যাওয়া হলো না। নাঃ, দেখছি জেলখানাটা আদৌ ভদ্রলোকের জায়গা নয়।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন, সতীশচন্দ্র দাস নামে সেখানে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন। সতীশবাবু একদিন সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্রের বাসায় গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র তখন তাঁর একটা পোষা পাখিকে খাওয়াচ্ছেন।

তা দেখে সতীশবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—একি শরৎদা, রাত্রে আবার পাখিকে খেতে দিতে হয়?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—এরা যখন জঙ্গলে থাকে, ইচ্ছামত খাদ্য যোগাড় করে নেয়। কিন্তু যখন লোকালয়ে আবদ্ধ থাকে, তখন আমাদের মত করে নিতে হয়। যখন ভালবেসে পাখিকে আনা হয়েছে, সে ভালবাসা তাকে দেখাতে হবে। পাখি যখন তোমার আচার ব্যবহার শিখতে থাকে, তখন তুমিও পাখিকে নিজের করে নিয়ে ভাল না বাসলে তাদের প্রাণে লাগে। যতক্ষণ বনের পাখিকে নিজের করে নিতে না পারবে, ততক্ষণ এদের আটকে রাখবে কেন?

শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় একটি সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সঙ্গে ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এমন সময় এক বড়লোকের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটি পাখির আর্তনাদ। বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই পাখিটার কোন বিপদ হয়েছে। তখনই তিনি সেই অপরিচিত বড়লোকের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন।

বাড়ির দরোয়ান তাঁর পথ রোধ করলো, কিন্তু তিনি কোন বাধা মানলেন না। গিয়ে দেখলেন, উঠানে একটি কাকাতুয়া পাখি তার দাঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে লম্বা চেনে তার গলা জড়িয়ে ফেলেছে। তাই জড়ানো ফাঁস থেকে উদ্ধার পাবার জন্য চিৎকার করছে কাতর কণ্ঠে।

শরৎচন্দ্র তখনই পাখিটার কাছে গিয়ে তার গলার ফাঁস খুলে দিলেন।

দরোয়ান ততক্ষণে ধরে নিয়েছিল, বোধ হয় কোন প্রতিবেশী চোর তার মনিবের কাকাতুয়াটিকে চুরি করতে এসেছে। তাই সে হাত পাকিয়ে সেদিকে অগ্রসর হতে হতে চিৎকার করতে লাগলো—এই, কৌন হ্যায়, ক্যায়া মাংতা?

এমন সময় বাড়ির মালিক এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। দু'জন অপরিচিত লোককে বাড়ির প্রাঙ্গণে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কাকে চান?

শরৎচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এ পাখি আপনার?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন —হ্যাঁ।

শরৎচন্দ্র বললেন—জীবজন্তু পুষতে হলে অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন? পাখিটা কতক্ষণ থেকে যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁশ নেই।

বাড়ির মালিক মনে করলেন, ভৎর্সনা-কারী হয়তো পাগল বা অন্য কিছু। তাই বিরক্তভাবে ও সন্দিগ্ধ নয়নে আগন্তুক দু'জনের দিকে তাকালেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললেন—আপনি বোধ হয় চেনেন না ওঁকে, উনি হলেন শরৎচন্দ্র···

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ? ঔপন্যাসিক ?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ।

তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বললেন—এভাবে যখন এসে পড়েছেন গরীবের বাড়িতে তখন—

নিমেষে শরৎচন্দ্রের গলার স্বর বদলে গেল। একান্ত পরিচিতের মত বলে উঠলেন না না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি···দেরি হয়ে গেল ···চল চল নেপেন···

বলতে বলতে শরৎচন্দ্র একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

একদিন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

জলযোগের পর শ্যামাপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে অনেক রকম কথাবার্তা হলো। শরৎচন্দ্র বললেন—বাংলার গৌরব আশুতোষের পুত্র তুমি। তোমার পিতার আকাঙ্ক্ষা তোমার দ্বারা চরিতার্থ হবে। আমরা সকলেই আশা রাখি তুমি বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করবে।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—আপনারাই তো বাংলা সাহিত্যকে স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানে আমরা কি করতে পারি, আর আমাদের করণীয়ই কি থাকতে পারে ?

শরৎচন্দ্র বললেন—অনেক কিছু করার আছে তোমার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়েছ তুমি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পথ তাতে আপনা থেকে প্রশস্ত হবে।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—আমি তো নানাভাবে চেষ্টা করছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগে অনেক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশে অগ্রসর হয়েছি। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার ও উন্নতি সাধনেও হাত দিয়েছি। এখন আপনাদের আশীর্বাদ। ধর্ম, দর্শন,

বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনেক মূল্যবান বাংলা বই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছি এবং এখনও করছি।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—সেই সঙ্গে দু'একখানা গল্প উপন্যাসের বইও প্রকাশ করো। তা না হলে গল্প উপন্যাসের লেখকরা খাবে কি?

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—গল্প উপন্যাসকেও বাদ দেবো না। গল্প উপন্যাসই তো সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—গল্প উপন্যাসই জাতির প্রাণ। জীবন আর মন যখন নানা সমস্যা ও তত্ত্ব আলোচনায় শুকিয়ে আসে, তখন এই গল্প উপন্যাসই মানুষকে সঞ্জীবনী রস ধারায় তাজা রাখে।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—একথা আমি সব সময় স্বীকার করি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আপনার লেখা আমার খুবই প্রিয়। মনে যখন বিষাদ আসে, নানারকম অশান্তিতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন গল্প উপন্যাসই আমাকে আনন্দময় জগতে নিয়ে যায়। সেজন্য গল্প উপন্যাসকেও সাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ বলেই মনে করি।

শরৎচন্দ্র বললেন—আর একটা বিষয়ে আমি সব সময় চিন্তা করি। সেটা হচ্ছে বাঙালী সাহিত্যিকদের দুরবস্থার কথা। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীর সংখ্যা বাড়লেই তবে দেশের সাহিত্যিকরা দুটো পয়সা পাবে। বর্তমানে যাও বা কিছু বই বিক্রি হয়, তার চৌদ্দ আনাই প্রকাশক, প্রেস আর দপ্তরীর পেটে যায়। লেখক পায় দু'আনা। কি খাবে তারা? কি খেয়ে তারা চিন্তা করবে আর লিখবে? এসব কথা ভেবে সাহিত্য আর সাহিত্যিক দুটোকেই বাঁচাবার উপায় ঠিক করতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শক্তি আছে, আমার মনে হয় তার পক্ষেই এসব কাজে হাত দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে তুমি হচ্ছ তার উপযুক্ত লোক। সেজন্য অনেক আশা রাখি আমরা তোমার উপর।

শ্যামাপ্রসাদ একটু চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর বললেন—আমার পিতৃদেবের মনেও এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি একটা

পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন। আমার কাছে তাঁর সেই পরিকল্পনার খসড়া আছে, আপনাকে দেখাবো একদিন। এখন আশীর্বাদ করুন যাতে সেই পরিকল্পনাকে আমি সফল করে তুলতে পারি।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বাস ও আশা পোষণ করছি, তোমার দ্বারাই এই কাজ একদিন সার্থক হয়ে উঠবে।

সেদিন আলোচনা খুবই জমে গিয়েছিল। নলিনীবাবুও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আহার সেরে শরৎচন্দ্রের ও শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি ফিরতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে উঠতেন। আর গান্ধীজী এলে অনেক কংগ্রেস কর্মীই এসে সমবেত হতেন।

একদিন সেখানে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের নানা-রকম আলোচনা হচ্ছিল। দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পর শুরু হলো গল্প গুজব।

হঠাৎ কথা উঠলো, কোন্ বাঙালীর সঙ্গে মহাত্মাজীর সর্বপ্রথম আলাপ হয়। সেকথা শুনে কিরণশঙ্কর রায় বলে উঠলেন—ঐ গৌরবটা আমার পাওনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য আমি বিলেতে ছিলাম। মহাত্মাজী তখন বুয়র যুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স কোরের কার্যোপলক্ষে বিলেতে এসেছিলেন। গান্ধীজীর তখন খেয়াল হয়েছিল বাংলা শেখবার। উনি তখন আমাকে মাস্টার রেখেছিলেন।

দেশবন্ধুর বোধহয় ব্যাপারটা জানা ছিল না। কাজেই অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন—তাই নাকি? তা ছাত্রটিকে কতখানি বাংলা শিখিয়ে-ছিলে কিরণ?

কিরণশঙ্কর হাসতে হাসতে বললেন—ছাত্রটি যে তেমন ধারালো ছিল না। তাই তো শিক্ষা তেমন এগোয় নি।

শরৎচন্দ্র এবার এ সম্বন্ধে মহাত্মাজীকেই প্রশ্ন করলেন—মহাত্মাজী, ইংলণ্ডে কিরণ কি আপনার গুরু ছিল?

গান্ধীজী তাঁর স্বভাব-সুলভ হাসি হেসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, বিলেতে ওর কাছে আমি বাংলা শিখতাম।

শরৎচন্দ্র এবার বেশ গম্ভীরতার ভাব দেখিয়ে বললেন—ঐ জন্যই আপনি বাংলা শিখতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সকলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্ব ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হলো। বইটির অনুবাদ করেছিলেন শ্রীকে. সি. সেন ও থিয়োডোসিয়া টমসন। ভূমিকায় ইংরেজিতে শরৎচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথাও ছাপা হলো। তাতে তিনি লিখেছিলেন –'বাংলা দেশে আমিই বোধহয় সবচেয়ে ভাগ্যবান লেখক যাকে সংগ্রাম করতে হয় নি।'

১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করা হলো।

১৯১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো 'নববিধান'। এই সময়ে কলকাতা থেকে বের হলো 'রূপ ও রঙ্গ' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক। পত্রিকার পরিচালক হলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং সম্পাদক হলেন শরৎচন্দ্র।

সবকিছু দান করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ রিক্ত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর স্নেহধন্য। নিজের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর মূর্তি দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই মূর্তি

শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখেছিলেন নিজের ঘরে। নিত্য পূজাহ্নিকের সঙ্গে তিনি সেই মূর্তির পূজা করতেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণ ঘটলো।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এই ঘটনা।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কয়েকদিন ধরে দেশের নানা স্থানে শোকসভা হতে লাগলো। হাওড়া জেলার বালি শহরেও হলো একটি বিরাট দেশবন্ধু-স্মৃতি-সভা। সেই সভায় সভাপতি হলেন শরৎচন্দ্র।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বললেন—একদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনি ডাল মেখে, নারকেল ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছেন। আর কোন তরকারি নেই। এই দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাঁকে বললাম—আপনি নিজের একি দশা করেছেন?

দেশবন্ধু বললেন—শরৎবাবু, আমি তো ডাল ও নারকেল ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছি। আমাদের দেশের অনেকের যে তাও জোটে না। তার জবাবে আমি আর কি বলবো! চুপ করে রইলাম।

গল্পের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র শ্রোতাদের মনে সেদিন এক করুণ শিহরনের সৃষ্টি করেছিলেন। সার্থক গল্পকার শরৎচন্দ্র!

দেশবন্ধু ছিলেন শরৎচন্দ্রের রাজনীতির গুরু।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র রাজনীতি থেকে বিদায় নেবার সংকল্প করলেন।

ষোল

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হলো ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন উদ্যোক্তাদের অন্যতম। সেই সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য শাখার সভাপতি করা হলো।

সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বললেন—

"বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত। তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন। কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প লেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলতে পারি। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা··· যে কথা সাহিত্য সাধনার দশ বৎসর কাল আমি নিঃসংশয় ও অকুণ্ঠিত চিত্তে ধরে আছি।··

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারদিকের সাহিত্যমণ্ডলী একদিন বাংলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন।···তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই।

…পূর্বের মত রাজারাজড়া জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না।…এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে…যেদিন সে আরও সমাজের নিচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।…"

মুন্সীগঞ্জের অধিবেশন শেষে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ঢাকায় এলেন। উঠলেন চারুবাবুর বাড়িতেই। রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধও এড়াতে পারলেন না। তাঁর বাড়িতেও আতিথ্য গ্রহণ করতে হলো। বেশ আনন্দেই কাটলো কয়েকটি দিন।

ঢাকায় যতদিন ছিলেন, একটা দুশ্চিন্তা শরৎচন্দ্রের মনকে সময় সময় ব্যাকুল করে তুলতো। যাবার আগে প্রভুভক্ত প্রিয় কুকুর ভেলুকে বেলগাছিয়ার পশু-হাসপাতালে ভরতি করিয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই তার কথা শরৎচন্দ্রের মনে পড়তো। ভেলু কেমন আছে কে জানে! পথে ঘাটে কুকুর দেখলে তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠতো।

কলকাতায় ফিরেই গেলেন হাসপাতালে। দেখলেন ভেলু ভাল আছে। গাড়ি করে তাকে নিয়ে এলেন শিবপুরের বাড়িতে।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ভেলু আবার অসুখে পড়লো। আবার ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। রাত জেগে কুকুরের শুশ্রূষা করতে লাগলেন। রোগের যন্ত্রণার সময় সময় কুকুরটি চিৎকার করতো—ছটফট করতো। কিছুই খেতে চাইতো না। একদিন জোর করে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে ভেলু তাঁর হাতে কামড়ে দিল। দাঁত ফুটে হাত বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো।

সবাই বললো—পাগলা কুকুরের কামড়—চিকিৎসা করানো দরকার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কোন হুঁশ নেই। ঐ হাত নিয়েই ভেলুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সারা রাত কাটলো শরৎচন্দ্রের অনিদ্রায়।

ভোর বেলায় ভেলু মারা গেল।

ভেলুর কামড়ে শরৎচন্দ্র একটুও উঃ-আঃ শব্দ করেন নি। কিন্তু তার মৃত্যুতে তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

বহুদিনের প্রিয় সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

নিজের হাতে কবর খুঁড়ে শরৎচন্দ্র ভেলুর কবর দিলেন।

শিবপুরের বাসা আর শরৎচন্দ্রের কাছে ভাল লাগে না। এই বাড়ি ছাড়বাব জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী খবর পেলেন, যে বাড়িতে তাঁরা আছেন, সে বাড়িটি বিক্রি হবে। তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়িটি কিনে নিতে বললেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতে রাজী হলেন না। বাড়িটি পুরনো, তা ছাড়া এখানে আছে ভেলুর স্মৃতি। কাজেই এ অঞ্চলেই থাকতে আর তাঁর মন চাইলো না।

বড়দিদি অনিলা দেবী শরৎচন্দ্রকে বললেন তাঁর বাড়ির কাছেই কিছু জমি কিনে রাখবার জন্য। শরৎচন্দ্র তাই করবেন স্থির করলেন। পানিত্রাস গ্রামটি তাঁর খুব পছন্দ। কাছেই রূপনারায়ণ নদী। চারদিকে ধূ ধূ করছে সবুজ মাঠ। সেই নদীর তীরে সামতায় শরৎচন্দ্র জমি কিনলেন।

পাশেই বড় গ্রাম গোবিন্দপুর। তার সীমান্তে এই জায়গাটি অবস্থিত বলে শরৎচন্দ্র নিজেই এই অঞ্চলের নাম দিলেন সামতাবেড়। এখানেই তৈরী হতে লাগলো শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন।

১৯২৬ সাল।

শুরু হলো রাজ্য জুড়ে দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষের ছায়া সামতাবেড় গ্রামেও এসে পড়লো।

খরা—ভয়ংকর খরা। পুকুর ডোবা খাল সব শুকিয়ে গেছে। নদীতেও জল নেই। ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে সব হলুদ হয়ে যেতে লাগলো।

আমাদের শরৎচন্দ্র—
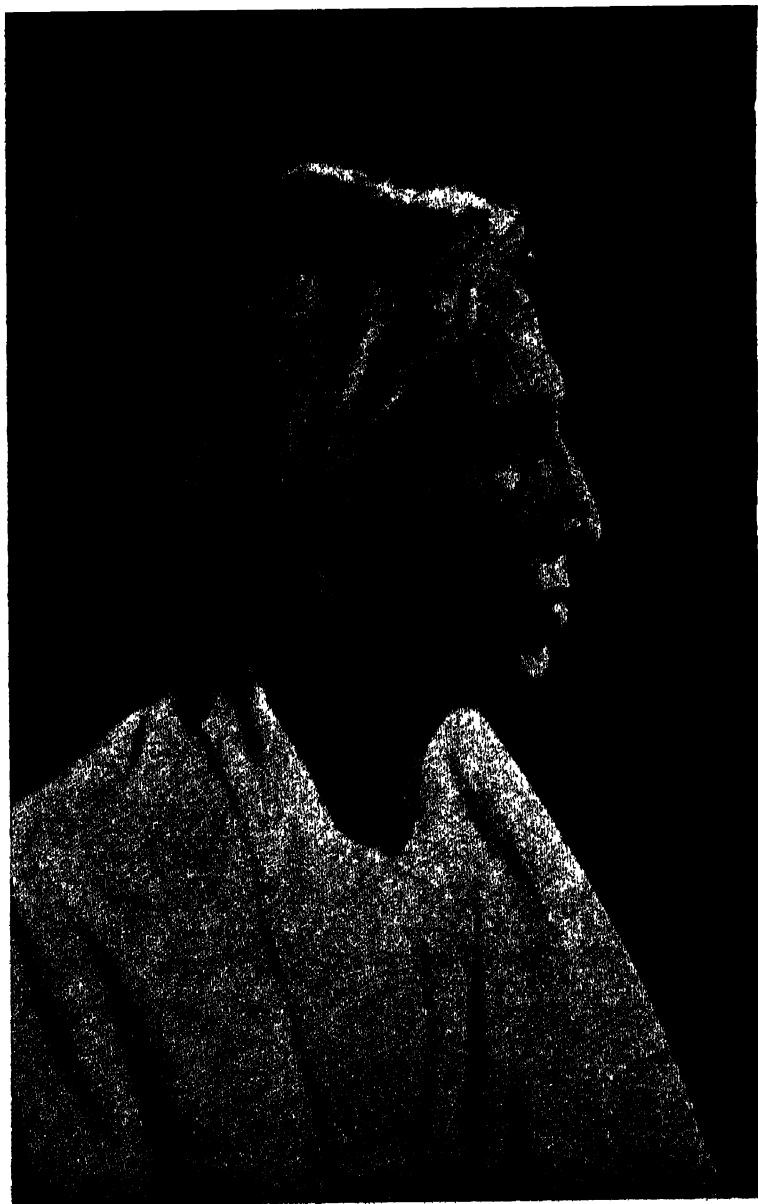
মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র মহা ভাবনায় পড়লেন। তাঁর বাড়ি তৈরির কাজ তখনও চলছে। পুকুর কাটা, বাগান করা, রাস্তা তৈরি করা—অনেক কাজই তখন বাকি! কিন্তু লোকের পেটে ভাত নেই, তারা খাটবে কেমন করে?

ভিক্ষে দিয়ে বা সাধ্যমত দান খয়রাত করে দেশের গরীব লোকদের উপকার করা যায়। কিন্তু তাতে পরোক্ষভাবে তাদের অপমানই করা হয়।

অনেক ভেবে চিন্তে শরৎচন্দ্র এক উপায় বের করলেন। ধান-চাল, টাকা পয়সা ওদের দাদন দিলেন। লেখা-পড়া কিছু রইলো না। কথা রইলো পরে তারা গায়ে খেটে সময় মত শোধ দেবে। বর্তমানে পুকুর কাটা, বাগান-রাস্তা তৈরি করা প্রভৃতি কাজ রয়েছে অনেক। এসব কাজ করলে তার মজুরী সঙ্গে সঙ্গেই পাবে।

গাঁয়ের দুঃস্থ মানুষেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মনের আনন্দে তারা করতে লাগলো কাজ। এভাবেই বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল।

নতুন বাড়িতে এসে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

সংসার এখন আগের চেয়েও বড়ো। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র বৌ নিয়ে দাদার কাছেই থাকে। মেজভাই প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী। তাঁর নাম এখন স্বামী বেদানন্দ। বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি অধ্যক্ষ। ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে অসুস্থ হয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্তন করতে শরৎচন্দ্রের বাড়িতেই এসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের শরীরও খুব ভাল নয়। কিছুদিন আমাশয়ে ভুগলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও খুব খারাপ হয়ে পড়লো। চলতে লাগলো কবিরাজী চিকিৎসা। কবিরাজ বিধান দিলেন—সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন রূপনারায়ণের দিকে। দেখতেন কখনো পাল তুলে কখনো দাঁড় বেয়ে চলে যায় নৌকার সারি। বাগান থেকে ভেসে আসে ফুলের গন্ধ।

শহরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পল্লীগ্রামে এ যেন অবসর জীবন

যাপন। তবু শহরের লোকের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। সুরেন মামা, উপেন মামা আসেন। লেখার জন্য সম্পাদকরা মাঝে মাঝে এসে হানা দেয়। মাঝে মাঝে একরাশ হাসির ডালি নিয়ে এসে হাজির হন জলধরদা—'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন। এমন সদা হাস্যময়, নিরভিমান ও পরোপকারী লোকটিকে শরৎচন্দ্র খুব ভালবাসেন। জলধর সেনও খালি হাতে কখনো ফিরে যান না। লেখা দিয়ে তবে শরৎচন্দ্রের রেহাই।

সামতাবেড় বাড়িতে শরৎচন্দ্র কয়েকটি ছাগল পুষতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন এক কসাই একটি পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে। পাঁঠাটি এমন করুণ ভাবে ডাকতে লাগলো যে তা দেখে শরৎচন্দ্রের মায়া হলো। তিনি কসাইয়ের কাছ থেকে পাঁঠাটি কিনে নিলেন, তারপর আশ্রয় দিলেন নিজের বাড়িতে। ওটার নাম দিলেন 'স্বামীজী'।

এই বাড়িতে কয়েকটি গরুও ছিল। শরৎচন্দ্র সেগুলির প্রতি খুব যত্ন নিতেন। দুটো গরু অনেকদিন দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই দেখে একজন শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—এদের বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন? পিঁজরাপোলে বিদায় করে দিন না।

শরৎচন্দ্র সেকথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—এরা এতদিন আমায় এত দুধ খাইয়েছে, আজ আমি ওদের ওপর অকৃতজ্ঞ হবো?

গরুর ওপর শরৎচন্দ্রের যে কি দরদ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'মহেশ' গল্পে। এই গল্পে একটি গরুর যে করুণ চিত্র তিনি বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে মূক প্রাণীকে নিয়ে এত ভাল গল্প আর আছে কিনা সন্দেহ।

পশুপাখীর ওপর শরৎচন্দ্রের অত্যধিক দরদ ছিল বলেই তিনি পশু-ক্লেশ নিবারণী সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি অনেকদিন ধরে পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি ছিলেন।

১৯৩০ সালের কথা। তখন তিনি সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি। গাড়োয়ানরা এই সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে এবং এই নিয়ে কলকাতা ও হাওড়ায় এক ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

শরৎচন্দ্র অত কিছু জানতেন না। সেই সময়ে ঢাকা যাওয়ার জন্য তিনি রওনা হয়েছিলেন। পথে শুনতে পেলেন সব ঘটনা। তখন তিনি ঢাকা যাওয়া বন্ধ করে ফিরে এলেন।

এই কথার উল্লেখ করে তিনি ঢাকায় তাঁর আমন্ত্রণকারী অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—ভাই চারু, আজ ঢাকার জন্য রওনা হয়েও বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্মঘট করায় এবং পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটেছে। সার্জেন্টদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনছি চারজন মরেছে।

কোনমতে হাওড়ায় দাঙ্গা বেঁচেছে, কিন্তু কাল কি হবে বলা যায় না। অথচ এই ডিপার্টমেন্টের কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না।

গরু বাছুর, ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু ছাড়াও মানুষের শত্রু বিষধর সাপের উপর পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের মমতা ছিল। পল্লীগ্রামে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ির আশে পাশে অনেক বিষধর সাপ ছিল। কিন্তু তিনি কোনদিনই সেই সব সাপকে মারতেন না এমন কি তাড়া পর্যন্তও দিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে একস্থানে লিখেছেন—শরতের সাপের উপর আজীবন ভালবাসা ছিল। সামতার বাড়িতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসের উপর বড় বড় সাপ রোদ পোয়াত। শরৎ পাহারা দিচ্ছেন, ছেলে মেয়েদের মানা করছেন 'ওরে তোরা ওদিকে যাস্‌নে। আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্ছে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।'

গাছপালার উপরও শরৎচন্দ্রর যথেষ্ট দরদ ও যত্ন ছিল। ছেলেবেলায় তিনি যেমন ফুলের বাগান করতেন, তেমনি বেশি বয়সেও সামতাবেড়ে

নিজের হাতে ফলের ও ফুলের চারা লাগিয়ে বাগান করেছিলেন। তিনি নিয়মিত ঐ সব গাছের যত্ন করতেন।

কলকাতার থেকে অনেক সাহিত্যিক বা সম্পাদক তাঁর বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে যেতেন। শরৎচন্দ্র এমনভাবে খালি গায়ে হাতে কোদাল বা নিড়ানি নিয়ে বাগানে কাজ করতেন যে দেখে মনে হতো কোন চাষী মাঠে চাষবাস করছে।

এ যেন অন্য এক শরৎচন্দ্র।

স্যার আশুতোষের ছেলেরা বের করেছেন 'বঙ্গবাণী' কাগজ। তাতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ধারাবাহিক ভাবে বের হতে লাগলো। সাড়া পড়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। 'পথের দাবী' তরুণ ও যুবকদের মনে জাগাতে লাগলো অনুপ্রেরণা। বিপ্লবীদের মনে জাগাতে লাগলো আশার আলো।

পুস্তকাকারে 'পথের দাবী' বাজারে বেরিয়ে গেল।

সারা দেশে তখন বিক্ষোভের ঝড় বইছে, অশান্তির আগুন জ্বলছে মানুষের মনে। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন! গুপ্ত সংগঠনে ছেয়ে গেছে দেশ। বিপ্লবীরা বিভ্রান্ত দিশেহারা। ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে, কখনো বা রাতের অন্ধকারে আসে বিপ্লবীরা। সামতাবেড় হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয়স্থল। শরৎচন্দ্র তাদের পরামর্শদাতা।

'পথের দাবী'তে আছে কোন্ পথের ইঙ্গিত!

'এদেশের মালিক যারা—তাদের কত জাহাজ, কত কলকারখানা, কত শত সহস্র ইমারত!···অথচ এই বাংলা দেশে দশ লক্ষ নরনারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম···এর একটার খরচে কেবল দশলক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়।···দেশে জল নেই, অন্ন নেই,··· গোধন নেই—দুধের অভাবে শিশুরা শুকিয়ে মরছে···দেশের মাটি

দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে ? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে ?'

কিছুদিন পরেই খবর এলো ইংরেজ সরকার 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করেছেন। বইয়ের দোকানে পুলিস যত কপি পাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে। লুকিয়ে চুরিয়ে এক একখানা বই বিক্রি হচ্ছে কুড়ি পঁচিশ টাকায়।

আরও খবর এলো, পুলিস বাড়ি বাড়ি ঢুকে খানাতল্লাসী করছে। যার কাছে বই পাচ্ছে তাকেই ধরছে।

সবাই মনে করলো—'পথের দাবী'র লেখকের উপরে চাপ আসবে। তাঁকে হয়তো গ্রেফতার করা হবে। নানা আশঙ্কা নিয়ে শরৎচন্দ্রও দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর আর্থিক ক্ষতি হলো, কিন্তু অপর দিক দিয়ে হলো বিরাট লাভ। মানুষের মনে যে শ্রদ্ধার আসন তিনি লাভ করলেন, অর্থ দিয়ে তার তুলনা হয় না।

এর কিছুদিন পরেই শরৎচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অগ্নিমান্দ্য—ক্ষুধা মোটে হয় না। শরীর দুর্বল। তারপর শুরু হলো জ্বর। বিছানা ছেড়ে ওঠবার আর ক্ষমতা রইলো না।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন—টাইফয়েড। সেই অনুযায়ী ঔষধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না।

খবর পেয়ে একদিন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হিরণ্ময়ী দেবী। বললেন—আপনি এসেছেন মামা, ভালোই হলো। আফিম ছাড়বার পর থেকেই ওর এই অবস্থা।

সুরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—শরৎ আফিম ছেড়েছে ? কদ্দিন হলো ?

—তা প্রায় মাসখানেক।

—কেন ?

—তা ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন, চৌকি ছেড়ে মেঝের উপর বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছেন শরৎচন্দ্র। জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে শরৎ ?

গলার স্বর শুনে শরৎচন্দ্র চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন—সুরেন মামা এসেছো ?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু অসুখ শরীর নিয়ে মেঝেতে শুয়ে আছো কেন ? আর হঠাৎ আফিম ছাড়বার দুর্বুদ্ধিই কেন হলো তোমার ?

শরৎচন্দ্র বললেন—জেলখানায় আফিম খেতে পারবো না বলে।

সেকথা শুনে অবাক হয়ে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার আবার জেলে যাবার কারণ কি ঘটলো ? কোথায় আবার কি অপরাধ করে বসলে ?

শরৎচন্দ্র বললেন—অপরাধ 'পথের দাবী' বই। সরকার কি শুধু বই বাজেয়াপ্ত করেই রেহাই দেবে ?

দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠলেন সুরেন্দ্রনাথ। বললেন—ওঃ, তাই বুঝি সাজা হবার আগেই নিজেকে সাজা দিচ্ছ ?

হিরণ্ময়ী দেবী বললেন—আফিম ছাড়ার পরে কয়েকদিন নিজের হাতে যাঁতায় গম পিষেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ হাসতে হাসতেই বললেন—ভালোই তো ! জেলে ওসব করায় কি না। আগেই শিখে নিয়েছে।

যা হোক, ডাক্তার ডাকানো হলো। ডাক্তার এসে সব কিছু শুনেও পরীক্ষা করে বললেন—ওপিয়াম ফিভার। পুরনো অভ্যেস হঠাৎ ছেড়ে দিলে এমনি হয়।

নতুন ভাবে চিকিৎসা শুরু হলো। ওষুধের সঙ্গে আফিম মিশিয়ে খাওয়ানো হতে লাগলো একটু একটু। এই চিকিৎসায় সুফল দেখা দিতে লাগলো। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের এখন আর এক সঙ্গী জুটেছে কুকুর টোব। ভেলুর

স্থান দখল করেছে এই নতুন কুকুরটি। কুকুরটিকে খুব আদর করেন।

টিয়া পাখি বাটুবাবার প্রতিও আদর যত্নের ত্রুটি নেই। অসুখ থেকে ওঠার পর তাঁর জন্য আসতো পেস্তা, বাদাম, বেদানা, কিসমিস। সেগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাটুবাবার পেটে যেতো।

বাটুবাবার প্রতি এত আদরের কারণ নাকি আরও একটি ছিল। শরৎচন্দ্র শিবপুরের বাড়িতে থাকার সময় একদিন এক ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দুপুরে তিনি বাড়ি ছিলেন না! বাড়ীতে অন্য কেউও ছিল না সেদিন। হঠাৎ একটি ছিঁচকে চোর বাড়িতে ঢুকে পড়লো। বাটুবাবা তাকে দেখেই চেঁচামেচি করতে লাগলো। চোর কিছু জামা কাপড় বগলদাবা করে বেরুতে যাচ্ছে—বাটুবাবার তা সহ্য হলো না। সে দাঁড়ের শিকল ছিঁড়ে এসে উড়ে বসলো চোরের গায়ের ওপর। ঠোকরিয়ে ঠোকরিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করলো।

এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র—বাড়ির লোকও এসে হাজির হলো। চোর জামাকাপড় ফেলেই দিল ছুট। সেই দিন থেকে বাটুবাবার আদর ভয়ানক বেড়ে গেল।

সতেরো

বর্ষাকাল।

হঠাৎ এক নতুন বিপদ ঘনিয়ে এলো। রূপনারায়ণের জল বাঁধ ভেঙে এগিয়ে আসতে লাগলো। গ্রাম বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়।

গ্রামের লোকদের মনে দেখা দিল আতঙ্ক।

শরৎচন্দ্র চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন গ্রাম রক্ষার কাজে। মাটি কেটে বাঁধ তৈরী করা, জল নিকাশ করে দেওয়ার কাজে লেগে গেলেন।

রূপনারায়ণের তখন কি ভয়ংকর রূপ!

ওদিকে স্রোতের টানে কত নৌকা হাল ভেঙে ডুবে যায়। ওঠে মাঝি মাল্লা ও আরোহীদের চীৎকার ধ্বনি। শরৎচন্দ্র লোকজন নিয়ে ছুটে যান বিপন্নদের উদ্ধার করবার জন্য।

বর্ষার প্রকোপ কমলো। কিন্তু শুরু হলো রোগের প্রকোপ। ঘরে ঘরে আমাশয়, উদরাময়, ম্যালেরিয়া।

অনেকদিন ধরে হোমিওপ্যাথিক বাক্সটা অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল। এবার শরৎচন্দ্র সেটা হাতে তুলে নিলেন। ঘুরতে লাগলেন বাড়ি বাড়ি। শুধু ঔষধই দেন না, নিজের হাতে শুশ্রূষাও করেন।

এদিকে নিজের বাড়িতেই মেজভাই স্বামী বেদানন্দ অসুস্থ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন ফল হলো না। জ্বর নিমোনিয়ায়

দাঁড়ালো। করা হলো নানারকম চিকিৎসা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

সামতাবেড়ের বাড়িতেই স্বামী বেদানন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শরৎচন্দ্র শোকে অধীর হলেন। মৃতদেহ সৎকারের পর তাঁর চিতা-ভস্ম এনে বাড়ির সামনেই তাঁর সমাধি রচনা করা হলো।

লতাপাতা ও ফুলে ঘেরা নির্জন সমাধি স্তম্ভের সামনে রোজ সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র দীপ জ্বালান। প্রতি বছর পালন করেন ভাইয়ের মৃত্যু-তিথি। সেদিন অহোরাত্র নামকীর্তন ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। গ্রামের লোকেরা নিষ্ঠাভক্তি সহকারে তাতে যোগ দেন।

অনেক গল্প উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র।

এবার নাটক রচনার দিকে মন দিলেন। নিজেরই লেখা 'দেনা-পাওনা'কে নাটকে রূপান্তরিত করলেন। নাম দিলেন 'ষোড়শী'।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উৎসাহেই এই নাটক লেখা হলো। শিশিরকুমারের নাট্যগৃহ নাট্যনিকেতনে ষোড়শী অভিনয়ের তোড়জোড় চলতে লাগলো। চলতে লাগলো নিয়মিত মহলা।

নির্দিষ্ট দিনে নাটকের শুভ উদ্বোধন হলো।

প্রধান ভূমিকায় অর্থাৎ জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমার এবং নাম ভূমিকায় চারুশীলা দেবী।

প্রথম অভিনয় রজনীতেই দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিজেও সেদিন উপস্থিত।

সুন্দর অভিনয়, সার্থক নাট্যরচনা।

দর্শকদের ঘন ঘন করতালিতে অভিনয় গৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো।

দেশবাসী জানতে পারলো, শরৎচন্দ্র শুধু ভাল উপন্যাসই লিখতে পারেন না, ভাল নাটকও লিখতে জানেন।

শরৎচন্দ্র যে পল্লীতে বাস করতেন, সেখানে কোন অশান্তি ছিল

না, কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু সেই নীরব পল্লীও একদিন সরব হয়ে

গ্রামের জমিদার মোহিনী ঘোষালের ছিল কয়েক বিঘে জলা জমি। সেই জমি তাঁদের বহুকালের দেবোত্তরের দান। হরিপদ, নরু সর্দার, গৌর মাঝি এবং আরও কয়েকজন গরীব প্রজা সেই জলা জমিতে মাছ ধরতো। সেই মাছ বিক্রি করে চলতো তাদের সংসার। সেখান থেকে জল সেচে নিয়ে অনেকে চাষ আবাদের কাজও চালাতো।

সেই গ্রামেরই এক প্রজা কেষ্ট বাগ গোপনে জমিদারের কাছ থেকে সেই জলাজমি পত্তন নিল। তারপর বেড়া এঁটে দিল চারদিকে। গ্রামের লোক তো ব্যাপার দেখে অবাক।

কেষ্ট বাগ বললো—এই জলাজমি আমার। কেউ যদি এর চতুঃ-সীমানায় আসে তা হলে তার ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

যে কয়েকজন গরীব প্রজা এতদিন তা ভোগ দখল করছিল আর যারা সেখান থেকে চাষের জল নিচ্ছিল, তারা সে কথা শুনে ক্ষেপে উঠলো। বললো—কি! এতদিনের ভোগ দখল করা জায়গা তোমার? এ হতেই পারে না।

কেষ্ট বাগ ভয় দেখালো। বললো—সেদিন চলে গেছে। আর বিনে পয়সায় ভোগ দখল করা চলবে না।

—আমরা বেড়া ভেঙে ফেলবো।

—কাছে এগিয়ে ছাখ, তোদের ঘাড়ে মাথা থাকবে না!

শুরু হলো দু'দিক থেকেই শাসানি। এদিকে দু'পক্ষই তৈরী হতে লাগলো।

একদিন মুখোমুখি এগিয়ে এলো দুই দল। সবার হাতেই লাঠি, সড়কি ও ঢাল।

রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেল।

উলুবেড়ের কোর্টে উঠলো মামলা। জমিদার পক্ষ থেকে নালিশ

করা হলো—তাঁর পত্তনীদারের লোকদের ভয়ানক ভাবে মেরেছে দখলকারী প্রজারা।

মূল আসামী করা হলো পাঁচকড়ি মুখুজ্যেকে। পাঁচকড়ি হলো শরৎচন্দ্রের বড়দিদি অনিলাদেবীর দেবর।

কাজেই শরৎচন্দ্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন প্রজাদের দলে। এবার তাঁর সাহিত্য চর্চা সিকেয় উঠলো। মামলার ব্যাপার নিয়েই ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

গরীব প্রজারাও শরৎচন্দ্রের মত একজন দরদী বন্ধুকে পেয়ে আশ্বস্ত হলো।

ফৌজদারির সঙ্গে চলতে লাগলো দেওয়ানি মামলা। কাজেই শরৎচন্দ্রের ব্যস্ততার সীমা নেই।

এদিকে আর এক ঝামেলা। সুভাষচন্দ্র এসে শরৎচন্দ্রকে বললেন —শরৎবাবু, আপনাকে কুমিল্লার রাজনৈতিক সম্মেলনে যেতে হবে।

কিন্তু কি করে এই সময়ে যাবেন! অথচ সুভাষচন্দ্রের অনুরোধও উপেক্ষা করা যায় না। তখন বাংলা কংগ্রেসে বেশ গোলমাল চলছে। নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি চলছে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র কুমিল্লায় গেলেন। কিন্তু সেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে ছিল না। বিরোধী দলের লোকেরাও সংখ্যায় ছিল অনেক। পথে একদল লোক শেম্ শেম্ ধ্বনি করেছিল, গাড়ীর ভেতর কয়লার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সম্মেলন পণ্ড হয় নি। বারো ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে শরৎচন্দ্র নগর পরিক্রমা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল দেড় মাইল লম্বা বিরাট শোভাযাত্রা।

সম্মেলনের শেষে শরৎচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন।

এদিকে মামলার ব্যাপার জটিল হয়ে উঠেছে।

জমিদার পক্ষ চেষ্টা করছে একটা গোলমাল পাকিয়ে মামলার

নিজের দিকটা সুবিধাজনক করে তুলতে। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করে ঘটনাস্থলে পুলিস চৌকী বসানো হয়েছে। কিন্তু জমিদার চেষ্টা করছে সেই পুলিসদের হাত করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে।

শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন, পরদিন সকালেই একটা গোলমাল বাঁধবে। তখনই তিনি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের অফিসে চলে গেলেন। গিয়ে বললেন—আপনাদের ঘটনাস্থলে যাওয়া দরকার, কাল শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে।

পুলিস-অফিস থেকে বলা হলো—কেন, পুলিস তো সেখানে আছে।

—কিন্তু তাতে জমিদার পক্ষেরই সুবিধা হবে। গ্রামে অশান্তি তাতে আরও বাড়বে।

—আপনি কে ?

—আমি গ্রামেরই একজন।

পুলিস পক্ষ থেকে আর কোন গরজ দেখা গেল না। শরৎচন্দ্র বিরক্ত হয়েই চলে আসবার জন্য পা বাড়ালেন। বললেন—মনে রাখবেন, এর পর যদি কিছু হয় তবে সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম ?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুহূর্তেই অফিসারের মুখের ভাব বদলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বসুন। আপনি লেখক শরৎচন্দ্র ? আমি এখানে নতুন এসেছি, তাই আপনাকে দেখে চিনতে পারি নি।

শরৎচন্দ্র বসলেন। পুলিস সাহেব বললেন—আপনি কোন চিন্তা করবেন না ! আমি নিজে আপনার সঙ্গে যাবো।

পরদিন ভোরে সেই জলাজমির চারদিকে লোকের ভয়ানক ভিড়। একটা গোলমাল যে শীগ্‌গিরই হবে তারই আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

হঠাৎ গাড়ি থেকে নামলেন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট। সঙ্গে শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র বললেন—গরীব চাষীরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ

এ শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাতপুরুষের চাষ আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। জমিদার বেআইনী ভাবে দেবোত্তর জমি পত্তন দিতে পারে না।

জমিদার বুঝতে পারলেন, মামলার ফল খুব ভাল হবে না। তাই তিনি মীমাংসা করতে রাজী হলেন।

মামলা মিটে গেল। গরীব প্রজারা শরৎচন্দ্রের কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইলো।

দরিদ্রের প্রতি মায়ামমতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং অতিথিপরায়ণতা শরৎচন্দ্রকে মহীয়ান করে তুলেছিল। তিনি নিজে যেমন খেতে ভালবাসতেন, তেমনি আবার অপরকে খাওয়াতেও ভালবাসতেন। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর বাড়িতে গেলে না খেয়ে আসতে পারতো না। এমন কি অচেনা অতিথিও সাদরে আপ্যায়িত হতেন।

একদিন গল্প-লেখক চারুচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের নতুন বাড়ি পানিত্রাসে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রকে দেখা এবং প্রণাম জানানো।

চারুবাবু একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সেই সময় সরকারী কাজেই ঐ অঞ্চলে ঘুরছিলেন।

শরৎচন্দ্র চারুবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করে দিলেন। যেন উভয়ের মধ্যে কতদিনের আলাপ।

কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর থেকে এক থালা গরম লুচি, বেগুন ভাজা ও কয়েকটি বাতাসা এসে উপস্থিত হলো।

চারুবাবু বলতে গেলেন—এসব আবার কি—

কিন্তু কথা শেষ করার আগেই শরৎবাবু তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যভরা কণ্ঠে বললেন—এই বেলায় ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে কি অভুক্ত অবস্থায় যেতে পারো ভায়া?

চারুবাবু বললেন—তা বেশ, কিন্তু বাতাসা আবার কেন?

শরৎবাবু হেসে বললেন—ওটা ভায়া গ্রামের ভদ্রতা।

আঠেরো

১৯৩১ সাল।

১১ই পৌষ টাউন হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন করার অয়োজন চলছে। অমল হোম রয়েছেন তার ব্যবস্থাপনায়।

তার কিছুদিন আগে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক এসে হাজির হলেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। অনুরোধ করলেন, টাউন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানাবো।

শুনে শরৎচন্দ্র খুব খুশী হলেন। বললেন—বেশ, ভালো কথা।

তাঁরা বললেন—কিন্তু আপনাকে মানপত্রটা লিখে দিতে হবে। আর সভাপতির পদও গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।

শুনে শরংচন্দ্র প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—সে কি কথা! দেশের এত জ্ঞানী গুণী থাকতে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আমাকে দিয়ে একাজ হবে না।

তাঁরা নাছোড়বান্দা। বললেন—আপনি ছাড়া কোন উপযুক্ত লোক আমরা পেলাম না। আপনার কোন আপত্তি আমরা শুনবো না।

শরৎচন্দ্রকে রাজী হতেই হলো।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে গমগম করছে

বিরাট সভাগৃহ। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে একসঙ্গে দেখবার জন্যও সমবেত হয়েছে অসংখ্য লোক। শরৎচন্দ্রের লেখা মানপত্র পাঠ করা হলো—

'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।'

শরৎচন্দ্র থাকতেন শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জনকোলাহল থেকে অনেক দূরে। এত নির্জন স্থানে থাকতেন বলে অনেকে তাঁকে বাড়িতে বন্দুক রাখতে উপদেশ দিতেন। শরৎচন্দ্র তাই একটি পিস্তলের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেয়েও ছিলেন। অবশ্য সেজন্য তাঁকে নির্দিষ্ট দিনে থানায় হাজিরা দিতে হতো।

লিখতেন তিনি অনেক রাত পর্যন্ত। এমন কতদিন গেছে, সারারাত জেগে লিখেছেন। খাবার ঢাকা থাকতো ওই ঘরের এক পাশে। কোনদিন খেতেন, কোনদিন খাবার পড়েই থাকতো।

সেই সময়ে তিনি 'বিপ্রদাস' লেখেন। আর লেখেন 'শেষ প্রশ্ন'। 'বিপ্রদাস' নামের পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস হয়তো ছিল। শরৎচন্দ্রের আপন ছোটমামার নাম ছিল বিপ্রদাস। বিপ্রদাস ভাগলপুরে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র বলতেন, তাঁর ছোটমামার মত ধর্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ এবং সাহসী মানুষ খুব কমই মেলে। তিনি বাস্তবে যা বিপ্রদাসকে দেখে-ছিলেন, বইয়ে প্রায় সেই ভাবেই চিত্রিত করে গেছেন। তা ছাড়া তাঁর বড়মামা ঠাকুরদাসের কথাও বলতেন। এই ঠাকুরদাস বিপ্লবীদের সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলেন। ইনি এক সময় বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

একদিন রাত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর ঘরে বসে লিখছেন। তখন গভীর রাত। বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ কেমন একটা শব্দ হতে তিনি জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। দেখলেন, জল কাদার মধ্য দিয়ে একটা লোক তাঁর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। গায়ে তার বর্ষাতি।

অজানা আশঙ্কায় মনটা তুলে উঠলো। তিনি পিস্তলটা বের করে চেঁচিয়ে বললেন—কে, কে ?

জবাব এলো—আমি।

—আমি কে ?

—চুপ করো। বলে লোকটি তাঁর জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো।

শরৎচন্দ্র প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। তারপর লোকটিকে ভালো করে দেখেই বলে উঠলেন—আরে, বিপিন মামা যে !

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ঘরের ভেতর এলেন। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কেমন করে এই দুর্যোগের রাত্তিরে এলে ?

১৯৩৫ সালে রবিবাসরে জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুনির্মল বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিপিন গাঙ্গুলী বললেন—অনেক কষ্টে এলাম ডিঙ্গি করে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেতে দাও, তারপর অন্য কথা।

শরৎচন্দ্র উঠে গিয়ে নিজের জন্য ঢাকা দেওয়া খাবারটা এনে বিপিন-বিহারীকে দিলেন। তার আগে পরতে দিলেন শুকনো জামা কাপড়। জামা কাপড় বদলে নিয়ে খেতে খেতে বিপিনবিহারী বললেন—আমার কিছু টাকার দরকার।

—টাকা? কত টাকা?

—চার হাজার টাকা। কালকের মধ্যেই টাকাটা চাই। রাসবিহারী বোসের কাছে পাঠাতে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আগে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করো তো। তারপর দেখি কি করতে পারি।

বিপিন গাঙ্গুলীর খাওয়া হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র ওপরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে। তাতে কিছু নগদ টাকা পয়সা আর সোনার গয়না। এসে দেখলেন বিপিন মামা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ঘুম ভাঙালেন না। নিজের লেখা নিয়ে বসলেন।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর বিপিনবাবু হঠাৎ চমকে জেগে উঠলেন। বললেন—আমাকে তো এক্ষুণি যেতে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আগে ঝড়বৃষ্টি থামুক, তবে তো যাবে।

বিপিন গাঙ্গুলী হেসে বললেন—তা হলে এখান থেকে আর যেতে হবে না। হাতে পুলিসের হাতকড়া পড়বে।

শরৎচন্দ্র চামড়ার ব্যাগটি তুলে দিলেন বিপিন গাঙ্গুলীর হাতে। বিপিনবাবু সেটা খুলে দেখে বললেন—দু' সেট গয়না দেখতে পাচ্ছি। বড় বউয়ের গয়নার সঙ্গে ছোট বউয়ের গয়নাগুলোও এতে দিয়ে দিয়েছ দেখছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—বড় বউ একাই শুধু পুণ্যটা অর্জন করবে কেন? ছোট বউও ভাগ করে নিক।

বিপিন গাঙ্গুলী বললেন—এখনো তো ছোট বউয়ের গয়নাগুলো

থেকে বিয়ের গন্ধ যায়নি। এগুলো তো প্রকাশচন্দ্রের বিয়ের আগে আমিই তোমার সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে কিনিয়ে দিয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন— যাক্, তোমার পছন্দ করা জিনিস তোমারই কাজে লাগলো।

সেই ঝড় জলের মধ্যেই বিপিন গাঙ্গুলী বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন ভোর হতে না হতেই পুলিস এসে হাজির হলো শরৎচন্দ্রের বাড়িতে বিপিন গাঙ্গুলীর খোঁজে।

পুলিস বাড়ি খানাতল্লাসী করতে চাইলো। শরৎচন্দ্র তাদের অনেক কিছু বলে তবে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেজন্য অনেক দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হলো।

১৯৩২ সাল। সেপ্টেম্বর মাস।

সেই টাউন হলেই আবার এক সভা। শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনার আয়োজন করলো তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী। স্থির হলো, রবীন্দ্রনাথ তাতে সভাপতিত্ব করবেন।

কিন্তু কোন কারণ বশতঃ রবীন্দ্রনাথ আসতে পারলেন না। তিনি এক আশীর্বাণী লিখে পাঠালেন।

'কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র,

তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সমুখে প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয় নি। ফলশস্য-বহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সমুখে আহ্বান করছে।

...আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয়, তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি।

...তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে

উঠবে তারা তোমার।...দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবি করবে; তাদের সেই নিরন্তন প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো।...

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি।...

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

সেই আশীর্বাণীর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—'কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার ক্ষুদ্রতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।'

উনিশ

বালিগঞ্জে মনোহর পুকুর অঞ্চলে ২৪, অশ্বিনী দত্ত রোডে জায়গা কিনেছেন শরৎচন্দ্র। সেখানে বাড়ি তৈরী হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে গিয়ে দেখাশোনা করেন। বাড়ি তৈরির কাজে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মুখার্জীর ওপর। রামকৃষ্ণ তাঁর বড়দিদি অনিলা দেবীর মেজো দেবরের ছেলে। ডাক নাম হোঁদল। অনিলা দেবীর নিজের কোন সন্তান নেই। তাই তিনিই তাঁর প্রিয় দেবরের ছেলেকে এই কাজে পাঠিয়েছেন।

বাড়ি তৈরী শেষ হলো। ১৯৩৪ সালে শরৎচন্দ্র নূতন বাড়িতে এসে উঠলেন।

ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র তখনও তাঁর সঙ্গে আছেন। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। ছেলে অমল ও কন্যা মুকুল শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয়! তাদের নিয়ে তাঁর আনন্দে দিন কাটে। নতুন কুকুর টেবি আর পাখি বাটুবাবা তো আছেই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বাজার তখন আরও জমজমাট। শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। বেরিয়েছে অনুরাধা, সতী ও পরেশ, বিজয়া প্রভৃতি বই এবং বিরাজ বৌ উপন্যাসের নাট্যরূপ। বিপ্রদাস প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে চারিদিকে বেশ সাড়া পড়ে গেল। অর্থাগম তাঁর ভালোই হতে লাগলো।

রামকৃষ্ণের উপর বাড়ির দেখাশোনার ভার দিয়ে শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত। সামতাবেড়ের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র থাকে, হিরণ্ময়ী দেবীও থাকেন কোন কোন সময়ে। অনিলা দেবী মাঝে মাঝে এসে দেখাশোনা করেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ি করে কলকাতায় এসেছেন, সেজন্য অনেক বন্ধুবান্ধবরাই খুব খুশী। তাঁরা সহজেই এসে দেখাশোনা করতে পারেন। কষ্ট করে দূরে ছুটে যেতে হয় না।

মাঝে মাঝেই শরৎচন্দ্রকে অনেকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হতো।

দিলীপকুমার রায়ের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝেই বসতো সংগীতের আসর। সংগীত জগতে দিলীপকুমার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কাজেই তাঁর বাড়িতে বিখ্যাত গায়কদের সমাগম ঘটতো।

একদিন প্রখ্যাত সংগীত-শিল্পী আবদুল করিম সাহেব দিলীপকুমারের বাড়ি আসবেন। সংগীত সভায় যোগ দেবার জন্য দিলীপবাবু তাঁর সংগীত পিপাসু বন্ধুদের অনেককেই নিমন্ত্রণ করলেন। ভাবলেন, শরৎচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করবেন।

যেদিন গানের আসর বসবার কথা, সেদিন সকালেই দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন—শরৎদা, আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটা গানের আসর আছে। বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক আবদুল করিম সাহেব গান করবেন। আপনাকে যেতেই হবে।

শরৎচন্দ্র কি যেন একটু ভেবে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তুমি যদি একটা ভরসা দাও তবে যেতে পারি।

দিলীপকুমার বিস্মিত হয়ে প্রকাশ করলেন—কিসের ভরসা বলুন তো?

শরৎচন্দ্র বললেন—শুনেছি আবদুল করিম সাহেবের ওস্তাদি গান

নাকি খুব চমৎকার। কিন্তু তোমার কাছে জানতে চাইছি, উনি গান করেন তো ভাল, কিন্তু থামতে জানেন তো?

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে দিলীপকুমার হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র খদ্দর পরতেন। খদ্দর তাঁর প্রিয় ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে তা নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তেন।

দিলীপকুমার রায় একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে আরও দু'একজন ভদ্রলোক ছিলেন।

নানা রকম কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলো। তারপর রাজনীতি থেকে এলো খদ্দরে।

খদ্দরের কথা উঠতেই শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে বললেন—দেখ, মণ্টু, খদ্দর পরা আর চলে না দেখছি।

দিলীপকুমার জিজ্ঞেস করলেন—কেন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—বাড়িতে চাকর-বাকর থাকতে চায় না। তারা বলে, কাপড় ধুতে গিয়ে ডোবাই বেশ, কিন্তু তুলবার সময় আর পারি না। চাকর-বাকরের কথা তো গেল। আর আমিও দেখছি—তোমাদের ঐ চর্মের মত মোটা খদ্দরের ঘর্ষণে কোমর আমার একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল হে।

বালীগঞ্জে তাঁর নূতন বাড়ি তৈরী হবার কিছুদিন পরে তিনি একখানি নতুন মরিস গাড়ি কিনেছিলেন। তাঁর ড্রাইভারের নাম ছিল কালী। কালী ছিল এক গোঁয়ার-গোবিন্দ দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সেই দুর্দান্ত কালী হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত অনুগত ভৃত্য।

যেদিন শরৎচন্দ্র কালীকে কাজে নিয়োজিত করেন সেদিন তাকে বলেছিলেন—কালী, আমি যতদিন বাঁচবো তোমার কোনও অভাব রাখবো না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি—যেদিন তুমি

গাড়ি চালাতে গিয়ে পথে কোনও মানুষ কেন একটা কুকুর, বিড়াল বা হাঁস মুরগীও চাপা দেবে সেদিনই তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাবে। আমার এই কথাটা মনে রেখো।

একদিন কবি নরেন দেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বেড়াতে বেড়াতে চলেছেন গড়িয়াহাট বাজারের দিকে। তাঁর কিছু দরকারী জিনিস কেনবার দরকার ছিল।

তখন ছিল শীতকাল, তবু টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। নরেন দেবের ছাতা ছিল সঙ্গে, দুজনেই একটি ছাতা মাথায় দিয়ে চললেন। গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে আসতে একটি বৃদ্ধা ভিখারিনী তাঁদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো। পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, বৃষ্টিতে ভিজে গায়ে লেপটে আছে। শীতে বুড়ী কাঁপছিল।

শরৎচন্দ্র তার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার মধ্যে যা ছিল সব উপুড় করে বুড়ীর হাতে ঢেলে দিলেন। বোধ হয় খুচরো পয়সা ও নোটে পনেরো কুড়ি টাকার কম হবে না।

বুড়ী ভিখারিনী অবাক্। এতগুলো টাকা নিতে সাহস হচ্ছিল না তার। ভাবছিল হয়তো বাবুটি ভুলে দিয়ে ফেলেছেন।

নরেন দেবও শরৎচন্দ্রকে বললেন—এ আপনি কি করছেন?

কিন্তু কোন কিছু গ্রাহ্য না করে শরৎচন্দ্র ভিখারিনীকে বললেন—মা, এ টাকায় তোমার যে ক'দিন চলে সে ক'দিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। একে শীত, তাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঠাণ্ডায় তুমি কাঁপছো। আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেবো।

—রাজা হও বাবা, বেঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক, বলে বুড়ী বুক ভরা আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

কুড়ি

১৯৩৬ সাল।

ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে দিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে দেশকে শক্তিহীন করার জন্যই ইংরেজের এই চক্রান্ত—এই আইন।

স্বদেশপ্রেমিকদের মনে এতে আঘাত লাগলো। নানাস্থানে এই নিয়ে দেখা দিল বিক্ষোভ।

১৫ই জুলাই কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে হলো এক বিরাট প্রতিবাদ সভা। শরৎচন্দ্র তাতে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন—রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হলো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয় নি, এ দুর্ভাগ্য দেশে কি তাই হলো…?

কিছুদিন পরে এলবার্ট হলে এই উপলক্ষে আর একটি সভার অনুষ্ঠান হলো। শরৎচন্দ্র হলেন সেই সভার সভাপতি।

শুধু কলকাতাতেই নয়, বাংলার সারা দিগন্তে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রসারিত। ঢাকার মানুষও শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাব উঠলো শরৎচন্দ্রকে অনারারী ডি-লিট উপাধি দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করলো। শরৎচন্দ্রকে

জানানো হলো সাদর আমন্ত্রণ। শরৎচন্দ্র তা গ্রহণ করলেন। ঢাকায় শুরু হলো তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন। যথাসময়ে শরৎচন্দ্র উপাধি গ্রহণের জন্য ঢাকায় রওনা হলেন।

নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে ষ্টীমার ভিড়লে দেখা গেল দলে দলে মানুষ তাঁকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে! স্কুল থেকে ছুটে গিয়ে ছাত্ররা আরো ভিড় বাড়িয়ে দিল।

ট্রেনে গিয়ে শরৎচন্দ্র ঢাকা ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানেও স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের কি ভিড়। মরমী কথা-শিল্পীকে দেখবার জন্য মানুষের কি আগ্রহ।

শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে কি জাদু! মানুষের মনের কথা কি সুন্দর করে বলতে পারেন, দুঃখের কথা লিখতে পারেন কি দরদ দিয়ে! যে কোন মানুষের অন্তর অতি সহজে তা স্পর্শ করে।

ঢাকায় গিয়ে শরৎচন্দ্র উঠলেন তাঁর বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেই বাড়িতে কয়েক দিন এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে কয়েক দিন তিনি ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দানের অনুষ্ঠান শেষ হলো। ওদিকে ছাত্র ও জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করছে। সবগুলিতেই যোগ দিতে হলো তাঁকে। মুসলমান প্রধান অঞ্চল ঢাকায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিপুল ভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের সময় বাংলার তদানীন্তন গবর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার সার জন এণ্ডারসন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার লেখার মধ্যে মুসলমান সমাজের পরিচয় হিন্দু সমাজের তুলনায় এত অল্প কেন? বাংলাদেশের অধিকাংশই মুসলমান, সুতরাং এদেশের সাহিত্যে তাদের কথা যথাযোগ্য স্থান লাভ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালী ঔপন্যাসিকদের রচনা পড়লে এদেশে যে মুসলমান বলে এত বড় একটা সম্প্রদায় আছে, তা জানতেও পারা যায় না।

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—আমি তো মুসলমান চরিত্র আমার রচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছি। তবে একথা সত্য তা সংখ্যার দিক থেকে এমন কিছু বিশেষ নয়।

সার এণ্ডারসন বললেন—আশা করি ভবিষ্যতে আরও মুসলমান চরিত্রের সৃষ্টি করে মুসলমান সমাজভিত্তিক উপন্যাস রচনা করবেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—নিশ্চয়ই করবো।

ঢাকায় অবস্থানের শেষ কয়েক দিন তিনি ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। ঐ সময়ে একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিরালায় বসে শরৎচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল।

উঠলো 'বিজয়া' নাটকের কথা। রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—বিজয়া নাটকে বিলাসের চরিত্রের ভাল দিকটা তেমন দেখানো হয়নি কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—ইচ্ছা করেই ওরকম করেছি। বিলাসের প্রতি দর্শকদের মনে সহানুভূতি জাগলে নাটকের মূল প্রস্তাব থেকে তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। তাতে নাটকের উদ্দেশ্য বিফল হবার এবং নাটকের মধ্যে যে কেন্দ্রগত ঐক্য থাকা আবশ্যক, তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল।

তারপর উঠলো 'পথের দাবী'র কথা। শরৎচন্দ্র বললেন—ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনের ব্যবসা চালাতো, এমন একটি দলের কথা আমি শুনেছিলাম। দলের নেত্রী ছিল একটি স্ত্রীলোক। এরা সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ব্যবসা চালাতো। এ থেকেই 'পথের দাবী'র সুমিত্রার সৃষ্টি। আর সন্ত্রাসবাদী দলের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। তাদের জীবনের ভিত্তির উপরেই আমার সব্যসাচীর সৃষ্টি।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অনেকবার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

যতুনাথ একদিন বলেছিলেন— আপনার লেখা পড়ে আমার যা ধারণা, তাতে মনে হয়, আপনার সাহস তো কিছু কমতি নেই।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ছোটবেলা থেকেই আমি দুঃসাহসী। তা কাজেই হোক আর লেখাতেই হোক।

যতুনাথ বলেছিলেন—দুঃসাহস নয়, সৎসাহস তা যতই দুর্বার হোক না কেন। আর একটা কথা এই সঙ্গে বলছি, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা যখন জাতির আর যুগের ইতিহাস লিখবেন, তখন তাঁরা বিভিন্ন যুগের গল্প উপন্যাসকে বাদ দিতে পারবেন না।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যতুনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনেক গল্প করতেন। শরৎচন্দ্রের কাছে যা শুনতেন তা কথা প্রসঙ্গে অনেক সময় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তো।

একদিন যতুনাথ বললেন—শরৎচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন—আমি গরিবের ছেলে ছিলাম। বই কেনার সংগতি আমার ছিল না। সহপাঠীদের কাছ থেকে ধার করে বই এনে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে তা ফিরিয়ে দিতাম, যেন সেই বই আর চাইতে না হয়। এতে আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল। তার ফলে যে দৃশ্য একবার দেখতাম, তা মনের ভিতর পুঁজি করবার ক্ষমতা আমার ছিল।

এটাই কি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য? শরৎচন্দ্র হয়তো তাই বলেন। কিন্তু যতুনাথের ধারণা—এটাই শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। ভাষার ওপর তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল।

১৯৩৬ সালেরই ঘটনা।

৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৬১-তম জন্মতিথি। 'রবিবাসরে'র উদ্যোগে সেই উপলক্ষে ২৫শে আশ্বিন কলকাতায় শরৎজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হলো।

রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই সভার প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই তিনি আশীর্বাণী পাঠ করলেন।

'কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র, তোমার সাহিত্যরস-মন্ত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে।...যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ংকর ভক্ত যেমন রাবণ।

'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেছে নানা জগৎ – নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।

...অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্য অপেক্ষা করেন নি।...তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পন্দন দিয়েছেন।

'সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে।

চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।…'

'রবিবাসর' শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মিলন-সভা। এর নিজস্ব কোন আস্তানা নেই। পঞ্চাশজন সদস্য এবং ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এক অনুষ্ঠান হয় পর্যায়ক্রমে কোন সদস্যের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের গৃহেও একদিন তার পালা পড়লো।

১৯৪৩ সালের তেসরা শ্রাবণ। রবিবার।

সকাল থেকে আকাশ জুড়ে মেঘের সমারোহ।

বেলা তখন দশটা। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের 'বিচিত্রা' অফিসে বসে লেখা নির্বাচন করছেন। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার ধরে উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন —হ্যালো, কে ?

অপর প্রান্ত থেকে জবাব এলো—আমি শরৎ। আজ আমার বাড়ি রবিবাসর, ভুলে যাওনি তো উপীন ?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—রবিবাসর কোনদিনই ভুলিনে, তার ওপর তোমার বাড়ি রবিবাসর। একথা ভোলানাথ হলেও ভুলতাম না।

তখন বৃষ্টি পড়ছিল। শরৎচন্দ্র বললেন—এই দেখ বৃষ্টি কি রকম পেছনে লাগলো। এতগুলো ভদ্রলোকের আসবার কথা, সব পণ্ড করে না দেয়। তা হলে তুমি আসছো কখন ?

—ধরো, চারটে সাড়ে-চারটের মধ্যে।

—বলো কি উপীন। তা হলে তো একবারে সভার সময়েই আসা হলো। দেখাশোনা হবে না একটু।

—তা হলে কখন যাবো বল ?

—স্নান সেরে সোজা চলে এসো। এখানেই খাওয়া দাওয়া করে সারাদিন আড্ডা দেওয়া চলবে, আর মাঝে মাঝে খানিকটা তদবির তদারকও করা যাবে।

উপেন্দ্রনাথ যখন বালিগঞ্জে শরৎচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হলেন তখন বৃষ্টি ছিল না। ঘুরে-ফিরে দেখলেন, তদবির-তদারক করবার বিশেষ কিছুই বাকী নেই। খুরি গেলাস, কলাপাতা, মিষ্টান্নাদি এসে গেছে। পাকশালায় জন-তিনেক রাঁধুনী আর যোগাড়ে মিলে মাছ মাংস পোলাও কালিয়া থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত। প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে সাদা ফরাশ পড়েছে, তার উপর গোটা দশ তাকিয়া।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে হবে, হঠাৎ উপেন্দ্রনাথের মাথায় একটি খেয়ালের উদয় হলো। বললেন—শরৎ, একটা কাজ করবে?

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কি কাজ?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই আছেন। তাঁকে আজ তোমার বাড়ি রবিবাসরে নিমন্ত্রণ করে আনবে?

চমকে উঠে শরৎচন্দ্র বললেন—বল কি উপীন?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—ঠিকই বলছি। ওপরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ফোন করবে চলো।

মাথা নেড়ে শরৎচন্দ্র বললেন—না না, উপীন, মিছামিছি ফোন ক'রে ওঁকে কুণ্ঠায়, ফেলে লাভ নেই। উনি বড় ঘরানায় অভিজাত বংশের মানুষ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঘরোয়া বৈঠকে আসবেন কেন?

শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথের চাপে শরৎচন্দ্রকে ফোন করতে হলো। ফোনে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথকে। শরৎচন্দ্র বললেন—আজ আমার বাড়ি রবিবাসরের অধিবেশন। আপনি যদি দয়া করে এসে মধ্যমণি হয়ে বসেন, তাহলে আমরা কৃতার্থ হই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—দেখ শরৎ যেতে আমার অনাগ্রহ নেই, কিন্তু যাবার বিষয়ে একটু অসুবিধা আছে।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কি অসুবিধে বলুন।

—উপস্থিত আমার যানবাহনের অসুবিধে।

—সেজন্য কোন অসুবিধে হবে না, আমি এখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তা হলে আর বাধা থাকে না।

তখনই শরৎচন্দ্র ড্রাইভার কালীকে ডেকে বললেন—গাড়ি বার করো। জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসতে হবে। আর দেখ, যাবার আগে গাড়িটা একটু সাফ করিয়ে নিয়ো। মস্ত লোক আসবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদস্য ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আসছেন শুনে সকলেই বিস্মিত ও অভিভূত। জলধর সেনও আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ফতোয়া জারি করলেন, আজ প্রবন্ধ পাঠও নয়, আলোচনাও নয়; আজ শুধু রবীন্দ্রনাথ বলবেন, আর আমরা শুনবো।

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের গাড়ি এসে হাজির হলো। গাড়ির দরজার সামনে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে জলধর সেন রবীন্দ্রনাথকে হাত ধরে নামালেন। তাঁকে দেখে হাসতে হাসতে রবীন্দ্রনাথ বললেন—এই যে জলধর দাদা! আপনিও এখানে আছেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—জলধর দাদাকে থাকতেই হবে, উনি যে আমাদের রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ।

জলধর সেন রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে সভাকক্ষে নিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্র যে ইজিচেয়ারে বসতেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের জন্য সেই ঘরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মাঝ-বরাবর স্থাপন করা হয়েছিল। তাতেই রবীন্দ্রনাথকে বসানো হলো। জলধর সেন একটি সুন্দর মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিলেন। কবিগুরু আসবেন জেনে শরৎচন্দ্রই লোক পাঠিয়ে মালাটি আনিয়ে রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম এবং শেষ আগমন।

১৯৩৭ সাল।

শরৎচন্দ্রের ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হলো।

পালিত হলো সাড়ম্বরে নানা স্থানে শরৎ জন্মোৎসব। কে জানতো, এই তাঁর জীবনের শেষ জন্মতিথি। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন অভিনন্দনের উত্তরে যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন, তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তিনি বলেছিলেন—

'সমবেত শ্রদ্ধা-নিবেদনের এই যে আয়োজন, আমি জানি এ আমার ব্যক্তিকে নয়, কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়; এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।···

'···আমার শক্তি কম, তবু নিজের দেশটিকে আমি বাস্তাবিক ভালবেসেছি—এর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, এর জলবায়ু, এর দোষগুণ, ত্রুটি, দলাদলি সব আমি ভালোবেসেছি,—এই আমার সারা জীবনের পাথেয়।···

'···সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখেব জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার···কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার।··· বাকদেবীর অর্ঘ্য-সম্ভারে ঐ স্বল্প সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা।···

'···এমনি করে জীবনের অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এগিয়ে এলো। এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসবো না। সেদিন একথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো, বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না···

'···আজ তাই কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে স্মরণ করি।···আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে—বিদায়।'

একুশ

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের জীবনে নানা রকম বিপত্তি দেখা দিতে লাগলো।

অসুখে অসুখে শরৎচন্দ্রের শরীর ভেঙে পড়ল। অনেক রকম রোগ। জ্বর, অজীর্ণ, বাত, অর্শ—রোগের পর রোগ তাঁর শরীরে এসে বাসা বাঁধছে। কোন রোগেরই কমতি নেই, বৃদ্ধির দিকেই তাদের গতি।

দিনে দিনে শরীর খারাপ হয়েই চললো।

কিছুদিন মুক্ত আবহাওয়ায় থাকবার জন্য কলকাতার বাড়ি ছেড়ে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে এলেন। কিন্তু সেখানেও এসে বিশেষ কোন উন্নতি হলো না।

পড়াশোনা, লেখালেখি প্রায় বন্ধ। 'বিচিত্রা'য় 'আগামীকাল' ও ভারতবর্ষে 'শেষের পরিচয়' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সে দু'টিও আর লেখা হচ্ছে না। মনে উৎসাহ নেই। লেখবার ক্ষমতাও যেন কমে গেছে।

বাড়ির লোকেরা স্থির করলো কলকাতায় নিয়ে তাঁকে কোন ভাল ডাক্তার দেখাবেন। শেষে তাই করা হলো। সামতাবেড় থেকে মাঠ ভেঙে ক্রোশ কয়েক পথ হেঁটে দেউলটিতে গিয়ে ধরতে হলো ট্রেন। এ ছাড়া অন্য কোন সুবিধাজনক পথ নেই। কলকাতার ডাক্তার বললেন, ম্যালেরিয়া। আবার সামতাবেড়ে ফিরে এলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু এই পথ হাঁটার দরুন তাঁর সর্দিগরমি ধরে গেল।

এখন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দরকার স্থান পরিবর্তন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে 'মালঞ্চ' নামে একটি বাড়ি আছে। তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—আমার 'মালঞ্চে' গিয়ে কিছুদিন থাকুন। শরীর হয়তো ভালো হবে।

শরৎচন্দ্র দেওঘরে গিয়ে কয়েকমাস রইলেন। শরীর সত্যি একটু ভালো হলো। আবার সামতাবেড়ে ফিরে এলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সর্দিকাশির প্রকোপ বাড়লো। পুরনো উপসর্গগুলিও আবার ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগলো।

শরীর নেতিয়ে পড়ছে। ক্রমশঃই নির্জীব হয়ে পড়ছেন শরৎচন্দ্র।

একদিন সামতাবেড়ের বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—এবার বুঝি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়, সুরেন মামা।

সুরেন্দ্রনাথ ধমকের সুরে বললেন—কি যে বলো! মানুষের বুঝি আর অসুখ হয় না।

শরৎচন্দ্র বললেন—হয়। তবে মনে হচ্ছে, এবার বোধ হয় আমাকে কালে ধরেছে। আমি আর বাঁচবো না।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—শরৎ অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তুমি কলকাতার বাড়িতে চলো। ডাক্তার বিধান রায়ের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো। তাঁর চিকিৎসায় তুমি ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু বিধানচন্দ্রের নামে শরৎচন্দ্রের বড্ড ভয়। কারণ তিনি এক নজরেই নাকি রোগ চিনতে পারেন। যদি সাংঘাতিক কিছু রোগের কথা বলে ফেলেন!

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন ওজর আপত্তিই শুনলেন না। শরৎচন্দ্রকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলো।

এবার আর হেঁটে নয়। রেল-স্টেশন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়া হবে পালকিতে। পালকিও ঠিক করা হলো।

যথাসময়ে দুয়ারে এসে দাঁড়ালো পালকি।

হিরণ্ময়ী দেবী সঙ্গে যেতে চাইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে বোঝালেন

—তুমি গেলে এদিকে কি করে চলবে! গোবিন্দজীর নিত্য সেবা কে করবে? খোকা তো এখানেই রইলো, মাঝে মাঝে সে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে।

শরৎচন্দ্র যাবার জন্য তৈরী হলেন। কাপড়জামা বদলে দাঁড়ালেন গিয়ে গোবিন্দজীর মূর্তির কাছে। দেশবন্ধুর দেওয়া সেই গোবিন্দজীর মূর্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্তও গলায় কণ্ঠি পরে শরৎচন্দ্র নিজের হাতে এঁর সেবা করেছেন।

গোবিন্দজীকে প্রণাম করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের চোখেও জল এলো।

সুরেন্দ্রনাথ ও প্রকাশের কাঁধে ভর দিয়ে শরৎচন্দ্র পালকিতে গিয়ে উঠলেন। ছলছল চোখে বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়ী দেবী। গাঁয়ের অনেক লোক এসে পালকি ঘিরে দাঁড়ালেন। সবার চোখেই জল!

গাঁয়ের পথ ধরে পালকি চললো দুলতে দুলতে। গাঁয়ের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে গেল অনেকদূর পর্যন্ত। হিরণ্ময়ী দেবী অশ্রুমাখা ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না পালকি তাঁর চোখের আড়াল হয়ে যায়।

কলকাতার বাড়িতে এলেন শরৎচন্দ্র।

তাঁর রোগের কথা চারদিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সবাই খোঁজ নিতে আসতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, চেনা অচেনা লোকের ভিড় লেগেই রইলো।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেখানো হলো। ডাঃ রায় রোগ ধরতে পারলেন। রোগটা সত্যই মারাত্মক। কিংকিংস—অর্থাৎ অন্ত্রে ক্যানসার। অপারেশন দরকার।

প্রথমে এক ইওরোপীয়ান নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সেখানকার পরিবেশে শরৎচন্দ্র অস্বস্তি বোধ করতে

লাগলেন। অবশেষে ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জীর 'পার্ক নার্সিং হোম'-এ তাঁকে স্থানান্তরিত করা হলো।

ডাঃ বিধানচন্দ্র বললেন—ডাঃ ললিত ব্যানার্জীকে নিয়ে অপারেশন করা হোক।

কিন্তু ললিতবাবুর অপারেশন করার চার্জ বারো তেরোশো টাকা। বিধানচন্দ্র চারশো টাকায় ঠিক করে দিলেন।

এখন রোগীর এবং বাড়ির লোকের সম্মতি দরকার।

প্রকাশচন্দ্র সামতাবেড় থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এলেন।

অস্ত্রোপচারে শরৎচন্দ্রের এবং হিরণ্ময়ী দেবীর সম্মতি পাওয়া গেল। কিন্তু তার আগে রোগীর শরীরে রক্ত দেওয়া দরকার। প্রকাশচন্দ্র নিজের শরীর থেকে রক্ত দিলেন।

খুবই গুরুতর অস্ত্রোপচার। অপারেশন টেবিলেই রোগীর প্রাণহানির আশঙ্কা। ডাঃ বিধানচন্দ্র এবং ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় দু'জনেই অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত রইলেন।

নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হলো। সকলেই ভাবলেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের আশঙ্কা কেটে গেল।

তবু সতর্ক থাকা দরকার। তাই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো, শরৎচন্দ্রকে যেন মুখ দিয়ে কিছু না খাওয়ানো হয়। বমির দমকে পেটের সেলাই ছিঁড়ে গেলে অনর্থ ঘটতে পারে। তাই করা হলো নল দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় বললেন,—একটু সুস্থ হলে শরৎচন্দ্রকে তিনি ভালো চিকিৎসার জন্য ইওরোপে নিয়ে যাবেন।

সকলের মনেই আশা, শরৎচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন, আবার তিনি লিখবেন। অসংখ্য লোক ঘন ঘন নার্সিং হোমে টেলিফোনে ও নিজেরা এসে খবর নিতে লাগলো।

পনেরোই জানুয়ারী, পয়লা মাঘ, শনিবার। রাত্রে শরৎচন্দ্রের

বমি শুরু হলো। ছুটে এলেন বড় বড় ডাক্তার। ফোনে খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব ছুটে আসতে লাগলেন। সবার ধারণা, শরৎচন্দ্র মুখ দিয়ে কিছু খেয়েছেন। কারুর সন্দেহ, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি মুখ দিয়ে আফিম গোলা জল খেয়েছেন!

পরদিন ষোলই জানুয়ারী, ১৯৩৮ সাল। বাংলা দোসরা মাঘ, ১৩৪৪, রবিবার।

সকাল থেকেই অবস্থা শোচনীয়।

ভোর হবার আগেই দলে দলে লোক নার্সিং হোমের বাইরে উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছে।

দমকে দমকে শরৎচন্দ্রের হেঁচকি উঠছে।

বেলা তখন দশটা।

বড় বড় চিকিৎসকরা দাঁড়িয়ে আছেন শরৎচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে। সবার মুখে উৎকণ্ঠা, হতাশা। সুরেন্দ্রনাথের মুখ বিষাদ পাণ্ডুর।

বুলেটিন বেরিয়েছে—রোগীর অবস্থা শোচনীয়। বাইরে অপেক্ষারত জনতা স্তব্ধ, ম্রিয়মাণ। ঘন ঘন খবরের কাগজ থেকে টেলিফোন আসছে হাসপাতালে। 'রয়টার' আর 'বেতারকেন্দ্র'ও মুহুর্মুহুঃ খবর নিচ্ছে।

রোগীর হাতটা হঠাৎ নড়ে উঠলো। তারপর সমস্ত শরীর হয়ে গেল নিস্পন্দ।

বুলেটিন বের হলো —শরৎচন্দ্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

জনতার চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা।

কেওড়াতলা শ্মশানে অমর কথাশিল্পীর নশ্বর দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হলো। পরে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে গিয়ে সামতাবেড়ের বাড়ির সামনে তৈরি করা হলো সমাধিস্তম্ভ। তাঁর প্রিয় ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দের সমাধির পাশেই সেই স্তম্ভ বিরাজ করতে লাগলো।

সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পেলেন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকের আঘাত! তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে—

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ও কর্মজীবনের প্রেরণা আমাদের অন্তরে অমর হয়ে থাকুক।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন—যতদিন বাঙলা ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন বাঙালীর সুখদুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্প কথার মতই বিস্ময়কর। বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী তাঁহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু অতি সহজভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথা-শিল্পী রূপে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিলেন। বাঙালী যেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল—যে গৌরব, সম্মান ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া বাঙালী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল এ যেন তাঁহার জন্মগত অধিকার স্বরূপ ছিল। মানুষ হিসাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যে আসিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও চিরদিনের মত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বাঙালী তাহার জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলুক, তবেই তাহার জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে; খাঁটি বাঙালী ও দেশ-প্রেমিক শরৎচন্দ্রের আত্মাও পরিতৃপ্ত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হলেন। কবিগুরু জানালেন তাঁর শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অমর কবিতায়—

> যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'॥

নানাকথা

গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্তমুন্সীর ছেলে অতুলচন্দ্রের সঙ্গে শৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। অতুলচন্দ্র মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় যেতেন এবং তাঁকে থিয়েটার দেখাতেন। অভিনয়ের বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে অনুরোধ করতেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্র তাই লিখতেন। অনেকে বলেন, দেবানন্দপুরে গল্প লেখায় শরৎচন্দ্রের হাতে খড়ি এভাবেই হয়।

১৮৯২ সাল। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ষোল বছর। এই সময় তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করেন, নাম দেন 'কাশীনাথ' শরৎচন্দ্রের সমবয়সী স্কুলের সহপাঠী পিয়ারী পাণ্ডিতের ছেলে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অনুসারেই উপন্যাসের নাম 'কাশীনাথ' দিয়াছিলেন। বিশ বৎসর পরে ১৯১২ সালে উহা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তারও পাঁচ বৎসর পরে।

ভাগলপুরে শুরু হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা। সময়কাল ১৮৯৪-১৯০৩। তাঁর এ সময়কার রচনা – 'পাষাণ', 'অভিমান', 'কোরেল'। এগুলির পাণ্ডুলিপি পরে আর পাওয়া যায়নি। এ সময়কার লেখা 'শুভদা'। এক মাসে তিনি 'শুভদা'র রচনা সম্পন্ন করেন। আঠার বছর পরে (১৯১৬) 'শুভদা' প্রকাশ লাভ করে।

নিরুপমা দেবী বলেছেন—"আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্য-জীবনে তাঁহাকে জানিতাম। আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। আমার দাদারা আমার লেখা কবিতা লইয়া অত্যন্ত আলোচনা

করিতেন। জানিলাম দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শরৎচন্দ্র—তিনিও দাদাদের মারফত আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক।

"প্রথম জীবনের আমার অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক আমাদের পরিবারের কয়েকটি সমবয়স্কদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। দুইটি ভাজ, একটি ভগ্নী এবং একটি দুই বৎসরের বড় সহোদর ভাই—ইনি শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট।

"…মেজভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্র পরিসর সাহিত্যচক্রে হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম দাদাদের বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিরুপমা দেবী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে গল্প উপন্যাস রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও হয়েছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বলেছেন—"যখন সমস্ত বঙ্গ সাহিত্যাকাশে আমাদের সাহিত্য 'রবির' আলোকে উদ্ভাসিত, তখন বাঙ্গলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত শহরের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্য-সভার মধ্যে যে আমরা একটি পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ গৌরব আমরা করিতে পারি।

"মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্যসভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবার চাইতে দুর্বল হইলেও গলার জোরে কাহারও চাইতে কম ছিলাম না।… আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।'

"শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত—কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সংগীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের 'জনা'র অভিনয়। জনার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন,

পরবর্তী কালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিতাম কিনা সন্দেহ।"

* * *

রেঙ্গুনে অবস্থান কালে আত্মীয় বন্ধুদের আগ্রহে শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার' পুস্তকের মন্দির নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে গল্পটি তিনি মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করে পঁচিশ টাকা পুরস্কার লাভ করে।

* * *

কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম দেবানন্দপুর।

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে জন্মভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জেগেছিল। শেষের দিকে কয়েক বছর তিনি প্রতিবারই দু'তিন দিন একাকী গ্রামে বেড়িয়ে আসতেন। বন্ধুবান্ধবদের কারও বাড়িতে কিছু সময় কাটাতেন এবং তারপর একবার নদীর তীরে ঘুরে বেড়াতেন।

১৩৩৫ সালে তাঁর জয়ন্তী দিবসে স্থানীয় যুবকরা স্থাপিত করেছিলেন 'শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার'। তিনি সেটিও ঘুরে দেখে আসতেন। এই পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার পর তিনি একটি আলমারি ও নিজের লেখা বই ছাড়াও অনেক বাংলা বই পাঠাগারে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল পরে তাঁর পৈত্রিক বাসভবনের কাছে আর একখানি ছোট বাড়ি ক্রয় করবেন এবং তারই একাংশে সেই পাঠাগার স্থায়িভাবে গড়ে উঠবে। তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী পাঠাগারটি অবৈতনিক করা হয়।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ওরে গ্রামের লোকের আগে চোখ ফুটিয়ে দে, তবে তারা বুঝবে নিজেদের ভালোমন্দ, যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না তারা কি চাঁদা দিয়ে বই পড়বে?

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরের বাড়ি খরিদ করার ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

আত্মকথা

সাহিত্যসেবা-সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যা লিখে গেছেন, শরৎ-জীবনীর উপকরণ-হিসাবে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্যই যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এইজন্য বেশীই যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহুঃ তামাক।

সম্ভবতঃ এই সময়েই...শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়...গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে ...কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার উপরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে

সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন··· বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমঝদার সমালোচকও তেমনি।···

ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু···দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবদের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।···

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি।

অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বছর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকৃত হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।"

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে শাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার

পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর এক দফা সংবর্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার শাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সংবর্দ্ধনার ঘটা—এমনি করে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল।

এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভরতি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে, যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সংগীত অস্পৃশ্য ; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে ; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সংগীতে অনুরাগ ; কাব্যে আসক্তি ; বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়।

এর পরে এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না ; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরনো পল্লীভবনে।

এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা', আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাস্টারমশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এই বার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাসসাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে ; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল

কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি। তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কি না—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমাব ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হল না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

…নানা অবস্থাবিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ —তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান

না করি। হেতু যত বড়ই হোক মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়।

আমি বুড়ো মানুষ, তবু ছেলেমেয়েরা আমাকেই···আমন্ত্রণ করে এনেছে।···আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানাতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে।

··ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার··দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে।

বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোর বয়স্কদেরও না।

এক্‌জামিনে পাস করার দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক্ করে রাখলে যে ভাঙার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সব চেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

নিজেও তো দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।

তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে করো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যে দিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমার ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয় ত পাবে না, হয় ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাকে কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায়।

সমাপ্ত